brac

ব্র্যাক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫
বিভাগঃ জাতীয়

প্রথম পুরস্কারঃ শিপন হাবীব
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ রাবেয়া বেবী
তৃতীয় পুরস্কারঃ সেবিকা দেবনাথ

শিপন হাবীব

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

মঙ্গলবার | ঢাকা ২৭ মে ২০১৪ | ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ | ২৭ রজব ১৪৩৫ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ১৫ | সংখ্যা ১১৪ | ২০ পৃষ্ঠা • ১০ টাকা www.ju

‘বন্ধু বলে দে, তর রোগ ভালো হয়ে গেছে ...!’

শিপন হাবীব

গলির রাস্তাটা দেখিয়ে দিল ছোট-ছোট হাতগুলো। ‘ওই তো, ওই রাস্তা দিয়েই চলে যান। রুবাই’য়ের বাড়ি পেয়ে যাবেন’ বলে দিল ক্লাস ফোর কি ফাইভে পড়ুয়া দু’তিন শিশু। বাড়িটির দিকে হাঁটতেই পেছন থেকে শিশুরা এ প্রতিবেদককে ডাক দেয় ‘হারইন আমরা আফনেরে রুবাইদ্দার কাছে লইয়া যামু’ (দাঁড়ান আমরা আপনাকে রুবাই’য়ের কাছে নিয়ে যাব)। রুবাই’র বাড়ির উঠানে পৌছতেই শিশুরা ডাক দেয় ‘বন্ধু বাইরঅই আও, সাংবাদিক আইছে’ (বন্ধু বের হয়ে আস, সাংবাদিক আসছে)। রুবাই’র ঘর থেকে বের হয়ে আসতেই শিশুরা জড়িয়ে ধরে উল্লাস করে করে বলতে থাকে, ‘বন্ধু বলে দে, তর রোগ ভালো হয়ে গেছে, তুই এখন সুস্থ।’ রুবাই’য়ের বয়স ১১ বছর। গত বছরের শেষের দিকে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। নিয়মিত ওষুধ খেয়ে রুবাই এখন পুরোপুরি সুস্থ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী আবদুল্লাহপুর গ্রামের মৃত আক্তার হোসেনের ছেলে রুবাই। শিশু মিলন,

রুবাই এখন পুরোপুরি সুস্থ

গেছে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

গেছে : ভালো হয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাজিব ও লিটন রুবাই’র বন্ধু। তিন শিশুর ভাষ্য, রুবাই’র বাবা মারা গেছে ৫ বছর আগে। যখন রোগটি ধরা পড়ে পড়শিরা ভয়ে তার বাড়ির ধারে কাছে যেত না। সে মুখে মাস্ক পরে রাখত। জানাল, এখন স্কুলে যাচ্ছি, বন্ধুদের নিয়ে খেলছি। মনেই হয়নি আমার যক্ষ্মা রোগ ছিল। রুবাই’র মা রুমা আক্তার বলেন, ছেলেকে নিয়ে চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। পাশের গ্রামের ব্র্যাক স্বাস্থ্যসেবিকা কুলসুম বেগমের পরামর্শে প্রথমে কফ পরীক্ষা পরে নিয়মিত ওষুধ সেবনে আমার ছেলে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোঃ শাহ আলম জানান, উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে বর্তমানে ১৩৫ জন যক্ষ্মা রোগীকে ব্র্যাক স্বাস্থ্যকর্মী ও সেবিকারা নিয়মিত ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। উপজেলার কমিউনিটি সেন্টারগুলোর দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীরাও যক্ষ্মা রোগী খুঁজে বের করছেন। নিয়মিত ওষুধ সেবনে উপজেলায় ৯৮.৮ শতাংশ রোগী পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছেন জানিয়ে তিনি বলেন, ব্র্যাক ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মী ডাক্তার সমন্বয় সেবায় শতভাগ রোগী সুস্থ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। আখাউড়া উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ শেখ বোরহান উদ্দিন বলেন, সম্মিলিত চেষ্টায় যক্ষ্মা রোগ শতভাগ ভালো করা সম্ভব। যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিকর খাবারও জরুরি জানিয়ে তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিরাও যেন যক্ষ্মা রোগ বিষয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন। যক্ষ্মা রোগী শনাক্তে স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে তারাও যেন ভূমিকা রাখেন। আখাউড়া উপজেলা ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির ম্যানেজার সাজেদুল ইসলাম জানান, উপজেলায় ব্র্যাকের ১৬টি যক্ষ্মা শনাক্ত সেন্টারের মাধ্যমে ৯৩ জন স্বাস্থ্য সেবিকা ও ৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করছেন। ১৩৫ জন রোগীকে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে যাদের মধ্যে প্রায় ১৮ জন শিশু রয়েছে। ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির সহযোগী পরিচালক ড. আকরামুল ইসলাম বলেন, সমাজের প্রতিটি মানুষ সচেতন হলে যক্ষ্মা রোগ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। ব্র্যাক সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

বুধবার ১৭ বৈশাখ ১৪২১
৩০ এপ্রিল ২০১৪

রাবেয়া বেবী

যক্ষ্মায় আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা আশঙ্কাজনক

অসচেতনতা ডেকে আনছে বিপর্যয়

রাবেয়া বেবী

দেশে যক্ষ্মায় আক্রান্ত শূন্য থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা আশঙ্কাজনক। তবে প্রকৃত পরিসংখ্যান এখনও হাতে নেই বলে জানান সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ। শিশুর যক্ষ্মা সম্পর্কে অসচেতনতা কিংবা তাদের যক্ষ্মা হয় না এমন ধারণা অনেক শিশুর জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। যক্ষ্মাক্রান্ত শিশুর ক্ষুধামন্দা হওয়ায়, ক্রমেই ওজন কমে কঙ্কালসার হওয়া, হাড় ও মেরুদণ্ড বাঁকা হওয়া, চিকিৎসা না হলে ফুসফুস থেকে মস্তিষ্কে ইনফেকসন হওয়ার কারণে শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কাও আছে বলে জানান বিশেষজ্ঞগণ।

তাদের মতে, বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশু পায় সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন। তবে যক্ষ্মা হলে মেয়ে শিশুর বিয়ের সমস্যা হওয়া, যক্ষ্মা ছোঁয়াছে হওয়ায় শিশু বৈষম্যের শিকার হওয়ার ভয় এবং এ রোগ পাপের ফল এমন কুসংস্কারগুলো রোগ নিরাময়ের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন তারা।

সরকার ও ব্র্যাক পরিচালিত ডিরেকলি অবর্জাভ ট্রিটম্যান সর্ট কোর্স-ডটস্ অর্থাৎ সরাসরি তত্ত্বাবধানে ওষুধ খাওয়ানো ডটস কর্মসূচির আওতায় এলে ছয় মাসে সম্পূর্ণ এ রোগ নিরাময়যোগ্য বলে জানান তারা।

২০১২ সালের সরকারি এক পরিসংখ্যান মতে, দেশে ৪৮৩৩ জন শিশু যক্ষ্মা চিকিৎসার আওতায় আছে এবং সে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মোট যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৯৭ জন। সে মতে, মোট যক্ষ্মা রোগীর ৩ শতাংশ শিশু। তবে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে বলা হয়, বর্তমানে দেশে মোট যক্ষ্মা রোগীর ৬ শতাংশই শিশু। আর চিকিৎসকের ধারণা, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। এই বিষয় ব্র্যাক হেলথ, নিউট্রেশন এন্ড পপুলেশন বিভাগের সিনিয়র কন্সালটেন্ট ডা. শায়লা ইসলাম বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, কোন দেশের মোট যক্ষ্মা রোগীর ৯ থেকে ১০ শতাংশ শিশু হওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী আমাদের দেশের যক্ষ্মাক্রান্ত শিশু যথাযথ শনাক্ত করা যায়নি।

পুরান ঢাকার সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, ঢালকানগর, বাংলাবাজার, জিন্দাবাহর এলাকায় সরেজমিনে জানা যায়, এই এলাকায় ডটস্ আওতায় বর্তমানে ২৯৩ জন শিশু চিকিৎসাধীন আছে (মিটফোর্ড হাসপাতালের তথ্য মতে)। বর্তমানে হাসপাতালে বেশ কয়েকজন যক্ষ্মাক্রান্ত শিশু ভর্তি আছে। হাসপাতালের শিশু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাজনিন আক্তার বানু জানান, তিন সপ্তাহের বেশি কাঁশি, দুই সপ্তাহের বেশি জ্বর, ওজন কমা, তিন মাসের বেশি সময় ওজন না বাড়া, খেলাধুলায় অনআগ্রহ ও নিস্তেজ হওয়া শিশুর যক্ষ্মার লক্ষণ। তিনি আরো বলেন, ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা হলে গলায় গুটি হয়ে ফুলে যায়, গিটেগিটে ফুলে ব্যথ্যা হয়, মেরুদণ্ড বাঁকা হয়, পেটে পানি এসে ফুলে যায়, ফুসফুস থেকে ব্রেইন ইনফেকসন করে। শিশুর যক্ষ্মা বড়দের চেয়ে একটু আলাদা হয়। প্রথমত তাদের কফ হয় না, তাই কফ পরীক্ষা করা যায় না। ফলে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিলে তাকে হাসপাতালে রেখেও পরীক্ষা করা হয়। আবার যখন শিশু ঠিক সময় মতো ওষুধ না খেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে পরে, তখন তাদের হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা হয়, ডটস্ কোর্সের ওষুধ ওজন নির্ণয় করে দেয়া হয়। শিশু নির্ধারিত ওজনের কম হলে তাকে অন্য চিকিৎসা দেয়া হয়। আবার অনেক সময় যক্ষ্মার ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় জন্ডিসসহ অন্য সমস্যাও হতে পারে তাই তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়।

মিটফোর্ড হাসপাতালে যক্ষ্মায় আক্রান্ত শিশুকে ওষুধ সেবন -ইত্তেফাক

ডা. শায়লা ইসলাম বলেন, এক বছর বয়সের নিচে যক্ষ্মাক্রান্ত শিশুদের পানিতে দ্রবণ উপযোগী ট্যাবলেট রেজিস্টার চিকিৎসকের পরামর্শ মতে নির্ধারিত পরিমাণে দেয়া হয়। আমাদের এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবিকা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই ওষুধ খাইয়ে আসে। সরকারই আমাদের এ ওধুষ দেয় এবং শিশুর যক্ষ্মা রোগের ওষুধ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তিনি বলেন, এই চিকিৎসা সরকারের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়।

গেণ্ডারিয়া মনিজা রহমান স্কুলের দশ বছর বয়সের এক শিক্ষার্থীর ৫ মাস আগে যক্ষ্মা ধরা পড়ে। ডটস্ কর্মসূচির আওতায় এসে সে এখন অনেকটাই সুস্থ। এখন শুধু কোর্স সম্পূর্ণ করার পালা। জিন্দাবাহার এলাকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যক্ষ্মা রোগীর মা বলেন, তার সন্তান পাঁচ মাস স্কুলে যায়নি। স্কুলের শিক্ষকদের জানালে তারা স্কুলে আসতে বারন করেন।

এই বিষয় অধ্যাপক ডা নাজনিন আক্তার বানু বলেন, শিশুদের যক্ষ্মা ঝুঁকি পূর্ণ হওয়ার কারণ রোগ শনাক্ত করা কঠিন, কিন্তু ছোঁয়াছে না। তিনি আরো বলেন, গর্ভবতী মায়ের যক্ষ্মা হলে তার ডটস্ কোর্স (৬ মাসের ওষুধ সেবন) সম্পন্ন করলে গর্ভের সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। শিশুর যক্ষ্মা নিরাময়ে বাংলাদেশ পেড্রিয়াটিক এসোসিয়েসন ও জাতীয় যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি যৌথভাবে চিকিৎসকদের এক ট্রেনিং-এর আয়োজন করেছে বলেও তিনি জানান।

কেন শিশুদের যক্ষ্মা হয় এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বড়দের থেকেই শিশুদের যক্ষ্মা হয়। যেমন বাবা-মার মতো কাছের কারো যক্ষ্মা হলে সাত দিনের মধ্যেই সে পরিবারের শিশুর যক্ষ্মা হতে পারে। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের যে ২২টি দেশে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ। যক্ষ্মা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, অপুষ্টি, দারিদ্র্যতা প্রভৃতি সমস্যার কারণে প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৮.৭ মিলিয়ন (৮৭ লাখ) লোক নতুনভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ১.৪ মিলিয়ন (১৪ লাখ) লোক এই রোগে মৃত্যুবরণ করছে। এসব মৃত্যুর বেশির ভাগই (৯৮%) বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে ঘটছে।

বর্তমানে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শিশুদের যক্ষ্মা নিরাময়ে কি কি কর্মসূচি নিয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে কর্মসূচির লাইন ডিরেক্টর ডা. মো: আশেক হোসেন বলেন, দেশের মেডিক্যাল কলেজ হাসপতালে শিশুর যক্ষ্মা চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা আছে। সরকার বর্তমানে উপজেলা হাসপাতালেও পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থা চালু করছে। শিশুর যক্ষ্মা উপজেলা হাসপাতালে নির্ণয় করা যায় আমরা সেই ব্যবস্থা করছি।

প্রকাশনার ৬ বছর
সংবাদ

সেবিকা দেবনাথ

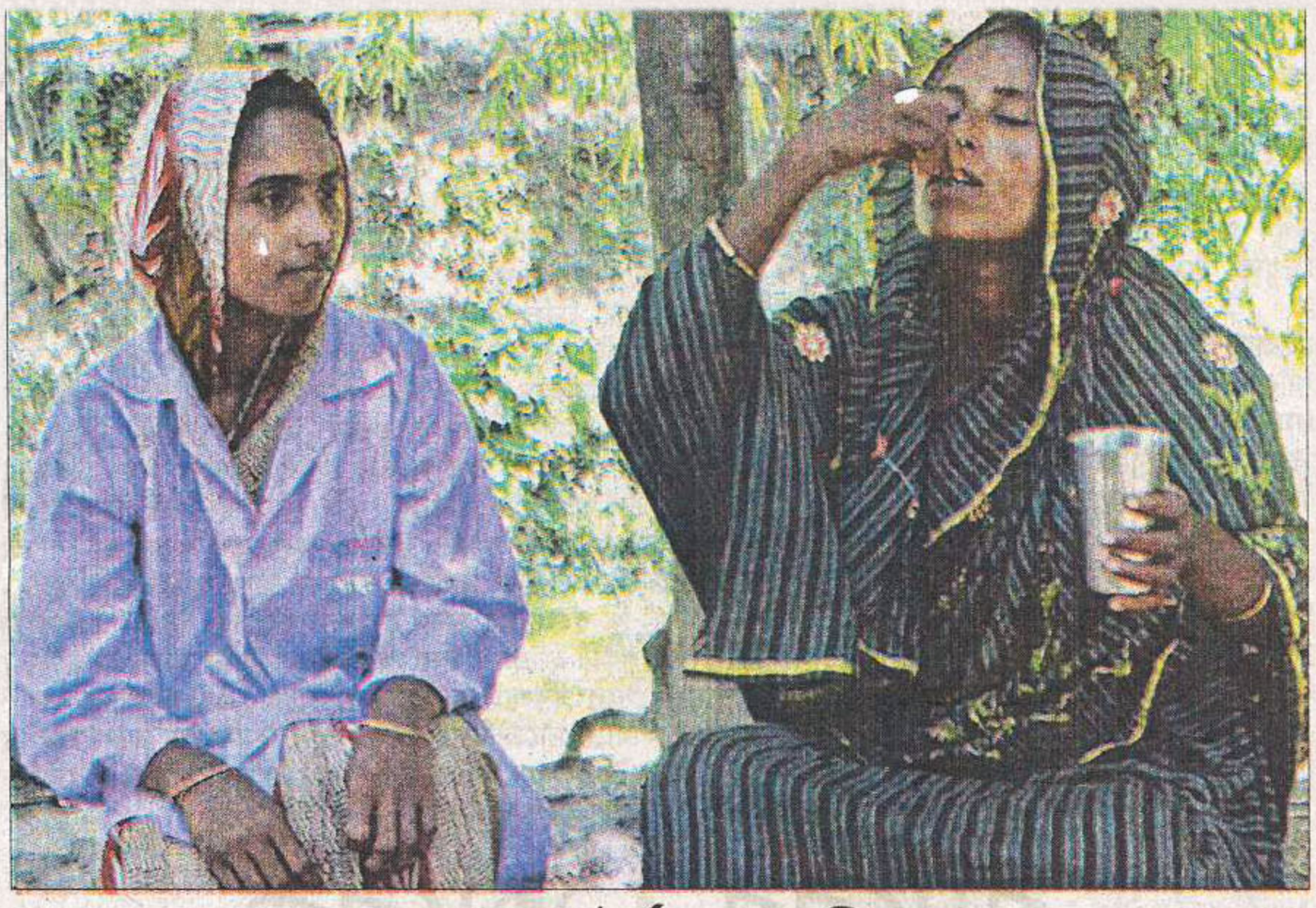

সোশ্যাল সাপোর্ট : দরিদ্র মানুষের যক্ষ্মা শনাক্তে কার্যকরী উদ্যোগ

- গত বছর সেবার আওতায় ১ লাখ ৮১ হাজারের বেশি
- রোগী শনাক্ত ৩২ হাজার ৯৫৬ জন

সেবিকা দেবনাথ

জেসমিন আক্তার (৩৫), আবু হোসেন (৫০) ও মো. হাসু মিয়া (৫০)। তারা তিনজনই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার হোমনার রাজাকাশিপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনজনই ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মায় আক্রান্ত।

দিনমজুর স্বামী মোস্তফা আর ৫ সন্তান নিয়ে জেসমিন আক্তারের সংসার। বাক প্রতিবন্ধী আবু হোসেন থাকেন ভাইয়ের সংসারে। বিয়ে করলেও বাক প্রতিবন্ধী হওয়ায় তার সংসার টেকেনি। বড় ভাইকে কৃজিকাজে টুকটাক সাহায্য করেন আবু হোসেন। আর এক সময় তাঁতীর কাজ করলেও তিন সন্তানের পিতা হাসু মিয়া এখন বেকার। যক্ষ্মার বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়ার পর ৫ মাস আগে স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবিকার পরামর্শে তারা তিনজনই কফ পরীক্ষা করান। কফ পরীক্ষায় যক্ষ্মা রোগের কোন জীবাণু পাওয়া যায়নি। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তারা তিনজনই ব্র্যাক পরিচালিত সোশ্যাল সাপোর্টের আওতায় যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা করান। সেখানেই ধরা পড়ে জেসমিন, আবু হোসেন ও হাসু ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মায় আক্রান্ত।

ব্র্যাকের তথ্য মতে, যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আছে এই সন্দেহের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন দরিদ্র মানুষকে সোশ্যাল সাপোর্টের আওতায় ফ্রিতে জিন এক্সপার্ট, এক্সরে, এফএনএসি, বায়োপসি সোশ্যাল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

নামক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীদের যাতায়াত বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়। যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করতে গ্লোবাল ফান্ডের সহায়তায় ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে সোশ্যাল সাপোর্ট প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্প চলবে ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সোশ্যাল সাপোর্টের আওতায় আনা হয়েছে ১ লাখ ৮১ হাজার ৬৬৮ জনকে। এর মধ্যে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছে ৩২ হাজার ৯৫৬ জন।

আর হোমানা ব্র্যাক অফিসের তথ্য মতে, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত সেখানকার ৫০২ জনকে সোশ্যাল সাপোর্টের আওতায় সেবা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছে ১০৫ জন।

২০১৩ সালে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় এক লাখ ৮৪ হাজার ৪৯২ জন যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে শনাক্তকরণের হার প্রতি লাখে ১১৯ জন। কফে জীবাণুযুক্ত যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছে এক লাখ ৫ হাজার ৫৩০ জন, কফে জীবাণুমুক্ত যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছে ৪২ হাজার ৩৪৫ জন, ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছে ৩৩ হাজার ৬৫৩ জন, শিশু যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছে ৫ হাজার ৪৪ জন। ওষুধ প্রতিরোধী (এমডিআর) যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৪ হাজার ২০০ জন। এর মধ্যে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে ৬৮২ জনকে। বর্তমানে দেশে যক্ষ্মা রোগী শনাক্তকরণের হার ৭০ শতাংশ এবং চিকিৎসায় সাফল্যের হার ৯২ শতাংশ।

হোমনা ব্র্যাক অফিসের সিনিয়র উপজেলা ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম সংবাদ'কে জানান, ওই এলাকায় ফুসফুস, ফুসফুস বহির্ভূত এবং ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগী রয়েছে দুইশ' জন। তিনি বলেন, দেশ থেকে যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করতে সোশ্যাল সাপোর্ট কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র রোগীরা যারা অর্থাভাবে রোগ শনাক্ত করতে পারেন না তাদের জন্য এই কার্যক্রম বেশ সহায়ক।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডিরেক্টর (টিবি অ্যান্ড ল্যাপ্রসি) ডা. মো. আশেক হোসেন সংবাদ'কে বলেন, যক্ষ্মার চিকিৎসা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করলেও দেশে যক্ষ্মা রোগীদের খুঁজে বের করে চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ এবং সুস্থ করার প্রচেষ্টা এখনও অপ্রতুল। ফুসফুসের যক্ষ্মা শনাক্ত করণের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয় না। ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা শনাক্ত করাই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন হয় এফএনএসি ও হিস্ট্রো প্যাথলজির মতো বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার। যা একজন দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয়বহুল। যক্ষ্মায় আক্রান্ত প্রত্যেকটি রোগী যাতে চিকিৎসা সেবার আওতায় আসে সেজন্যই সন্দেহজনক ব্যক্তিকে এই সোশ্যাল সাপোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়।

তিনি জানান, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের কার্যক্রমে খুশি হয়ে বাংলাদেশকে ৪ মিলিয়ন ডলার দেয় গ্লোবাল ফান্ড। ওই অর্থের কিছু অংশ সোশ্যাল সাপোর্ট কার্যক্রমের জন্য ব্যয় করা হয়।

তিনি বলেন, দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করতে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি যক্ষ্মা রোগী শনাক্তকরণের ওপরও আমাদের জোর দিতে হবে। গ্লোবাল ফান্ড আমাদের পরবর্তীতে এই কার্যক্রমের জন্য অর্থ দেবে কি না তা এখনও নিশ্চিত না। তবে আমি মনে করি গ্লোবাল ফান্ড যদি তাদের আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেয় সরকারের উচিত এই কার্যক্রম চালু রাখার জন্য বরাদ্দ রাখা।

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির সহযোগী পরিচালক ড. মো. আকরামুল ইসলাম সংবাদ'কে বলেন, যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধে কেবলমাত্র চিকিৎসাই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়টিও জড়িত। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত দরিদ্র মানুষকে শনাক্তকরণের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সোশ্যাল সাপোর্ট কার্যক্রমটি অবশ্যই ইতিবাচক। রোগ শনাক্তকরণ ও আরোগ্যের বর্তমান হার ধরে রাখতে পারলে ২০১৫ সালের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আমাদের সম্ভব হবে।

brac

ব্র্যাক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫
বিভাগঃ চট্টগ্রাম

প্রথম পুরস্কারঃ আবু দাউদ
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ মমতাজ উদ্দিন বাহারী
তৃতীয় পুরস্কারঃ আবু নাছের মঞ্জু

দৈনিক অরণ্যবার্তা

আর দাউদ

ব্র্যাক স্বাস্থ্য বিভাগের সেবিকা শেফালীর উপস্থিতিতে ঔষধ সেবন করছেন যক্ষ্মা আক্রান্ত এক রোগী। -অরণ্যবার্তা

জনসচেতনতার সুফল

যক্ষা রোগীকে DOTS পদ্ধতিতে ঔষধ সেবনে সহযোগিতা করছেন এলাকাবাসী

স্টাফ রিপোর্টার॥

যক্ষ্মা রোগ নিরাময়ে জনসচেতনতার সুফল পেতে শুরু করেছে রোগী ও সংশ্লীষ্টরা। যেখানে DOTS পদ্ধতিতে শুধু স্বাস্থ্য সেবিকারা রোগীকে ঔষধ সেবন করিয়ে থাকেন সেখানে এই পদ্ধতিতে সহযোগিতা করছেন এলাকাবাসী। রোগী স্বাস্থ্য সেবিকার বাসায় গিয়ে ঔষধ সেবন করলেন কিনা, স্বাস্থ্য সেবিকা ঠিকমতো রোগীর খোজ খবর রাখছেন কিনা, রোগীর স্বাস্থ্যগত অবস্থাসহ নানা খোজ খবর রাখেন এলাকাবাসী। এ বিষয়ে সিঙ্গিনালা গ্রামের মংসাপ্রু মারমা জানান, আমি ব্র্যাকের একটি কর্মশালায় গিয়ে জানতে পেরেছি, যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ। যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীকে সময়মত চিকিৎসা শুরু করতে না পারলে তার সংস্পর্শে এসে সুস্থ্য লোক আক্রান্ত হতে পারে। এভাবে রোগ ছড়িয়ে যাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। তাই যক্ষ্মা রোগ শুধু রোগীর সমস্য নয়, এটি সামাজিক সমস্যা। এই চিন্তা থেকেই আমাদের এলাকায় যক্ষ্মারোগীর খোজখবর নিয়ে তার চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খোজ খবর রাখি এবং এলাকাবাসীকেও সচেতন করি।

ব্র্যাক স্বাস্থ্য সেবিকা শেফালী মারমা জানান, তিনি সিঙ্গিনালা, পূর্ব সিঙ্গনালা, পেরাছড়া, স্বনির্ভর ও বসুন্ধরা এলাকার

প্রতিটি খানা পরিদর্শন করে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া রোগী আছে কিনা, রোগেল লক্ষণ ও প্রতিকার এবং ফ্যামেলী প্লানিং সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করাই তার কাজ। তিনি জানান, সিঙ্গিনালা এলাকায় যক্ষ্মা আক্রান্ত কংজ মারমা'র চিকিৎসা হচ্ছে তার তত্ত্বাবধানে। তিনি আরো জানান, কংজ মারমার প্রতিবেশীরা অত্যন্ত সচেতন। রোগী ঠিকমতো ঔষধ সেবন করছেন কিনা, সেবিকার কাছে আসছেন কিনা এবং তার শারীরিক বিষয় সম্পর্কেও নিয়মিত খোজ খবর রাখছেন এলাকাবাসী। এভাবে প্রত্যেকটি এলাকার লোক DOTS সর্ম্পর্কে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসলে যক্ষ্মা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

ব্র্যাক স্বাস্থ্য বিভাগের সিনিয়র জেলা ব্যবস্থাপক রুপম চাকমা জানান, একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে নিয়মিত চিকিৎসা প্রদানই হচ্ছে DOTS পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিদিন রোগীর ঔষুধ গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে যক্ষ্মারোগীর রোগ নিরাময় হার প্রায় ১০০ ভাগ। DOTS পদ্ধতিতে রোগীর হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয় না, রোগী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন এবং চিকিৎসা শুরুর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদান করতে পারেন।

স্বনির্ভর এলাকার ব্র্যাক স্বাস্থ্যকর্মী রিয়া চাকমা জানান, বাংলাদেশ ১৯৯৩ সাল থেকে যক্ষ্মা চিকিৎসায় DOTS পদ্ধতি অনুসরণ করে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিদিন সকালে খালিপেটে রোগী সেবিকার বাড়িতে এলে স্বাস্থ্যসেবিকা তাকে সেবন বিধি মোতাবেক ওষুধ খাইয়ে দিবেন। যদি কোন নির্দিষ্ট দিনে রোগী সেবিকার বাড়িতে না আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে সেবিকা রোগীর বাড়িতে গিয়ে, খোঁজ নিয়ে অনুপস্থিতির কারণ জেনে সমস্যা সমাধান করে ঐ দিনের ওষুধ খাইয়ে দেবেন। যদি সেবিকার পক্ষে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব না হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ ব্র্যাক অফিস বা পিওকে জানাবে এবং নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করবে । রোগী যদি কোনদিন কোন কারণে ওষুধ না খায় তবে চিকিৎসা কার্ডে ঐ তারিখের ঘরে "০" চিহ্ন দিতে হবে। DOTS পদ্ধতির মাধ্যমে মাল্টি ড্রাগ রেজিষ্ট্যান্স যক্ষ্মা (MDR) এড়ানো যায়।

খাগড়াছড়ির সিভিল সার্জন ডা. নারায়ন চন্দ্র দাশ জানান, (MDR) যক্ষ্মা খুবই ভয়ানক। রোগী যদি নিয়ামত ঔষধ সেবন না করে তাহলে সে পুনরায় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে পারে সেটিকে বলে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট যক্ষ্মা বা MDR টিবি। তিনি জানান, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট এটি মানুষের তৈরী। অনিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করলে, চিকিৎসার ক্যাটাগরি ভুল করলে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। MDR আক্রান্ত হলে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার প্রধান ২টি ওষুধই (রিফ-ামপিসিন ও আইসোনিয়াজাইড) জীবাণুর বিরুদ্ধে আর কাজ করেনা। তখন এর চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদী হয়।

MDR টিবি হলে কফ কালচার (Cough culture) ও ড্রাগ সেনসিটিভিটি টেষ্ট (DST) এই দুই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে হয়। তবে ঢাকার মহাখালী, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলাদেশে আর কোথাও এই পরীক্ষা করা যায় না। তবে নির্দিষ্ট জেলা পর্যায়ে Gene Xpert এর মাধ্যমে MDR টিবি দ্রুত সনাক্তকরনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি বলেন, MDR-TB রোগীর চিকিৎসা সময়কাল মোট ২৪ মাস এবং এই সময়কে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। Intensive Phase- প্রথম ৬ মাস। এই সময়ে রোগী হাসপাতালে ভর্তি থেকে নিয়মিত চিকিৎসা নিতে হবে। পরবর্তী ১৮ মাসকে বলা হয় ontinuation Phase । এই সময়ে রোগী নিজ নিজ এলাকার দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য সেবিকা/ স্বাস্থ্য কর্মীর উপস্থিতিতে নিয়মিত ঔষধ সেবন করবে। এম ডি আর-টিবি রোগীর ঔষধ খাওয়ার পর কোন সমস্যা হলে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোন ঔষধ খাওয়ানো যাবে না এবং ঔষধ খাওয়ার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে টিবির ঔষধ খাওয়া বন্ধ না করে ডাক্তারের শরনাপন্ন হতে হবে। রোগীর প্রতি মাসে ফলোআপ কফ মাইক্রোসকপি পরীক্ষা করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর কফ কালচার করার জন্য ঢাকায় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। সরকার, ব্র্যাক ও সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে MDR রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। তিনি যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের জনগনের অংশগ্রহণ কামনা করেন।

ব্র্যাক স্বাস্থ্য বিভাগের সিনিয়র জেলা ব্যবস্থাপক মো. ফজলুল হক জানান, বড়দের মতো শিশুদের যক্ষ্মারোগ হতে পারে। তবে শিশুর যক্ষ্মারোগ সনাক্তকরণের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন । কারণ কফ পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুদের যক্ষ্মারোগ নির্ণয় নাও করা যেতে পারে। ০ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুরাই যক্ষ্মারোগের জন্য বেশি মাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। এ ছাড়া কিছু রোগ (যেমন-হাম, অপুষ্টি, হুপিংকাশি, এইচআইভি/এইডস) যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, সেগুলোও যক্ষ্মারোগ হওয়াকে ত্বরান্বিত করে। ফুসফুস বহির্ভুত যক্ষ্মা (এক্সট্রা পালমোনারি টিবি) শিশুদের বেশি হয়। যদি কোন শিশু যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে আসে এবং তার যক্ষ্মার কোন লক্ষণ না থাকে তবে তাকে যক্ষ্মা প্রতিরোধ ব্যবস্থা (৬ মাস প্রতিদিন INH ১০ মিলিগ্রাম/কেজি) এর আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশে মোট যক্ষ্মারোগীর ৩% শিশু।

তিনি জানান, সরকার, ব্র্যাক ও সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে শিশু রোগী সনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে

শিশুর যক্ষ্মারোগের লক্ষণ: এক নাগার তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি, ৩ মাস ধরে ওজন না বাড়া বা ওজন কমে যাওয়া এবং আগের মতো খেলাধুলা না করা এবং ধীরে ধীরে নিস্তেজ বা দুর্বল হয়ে যাওয়া। এছাড়াও গলায় গুটির মতো ফুলে যাওয়া, গিঁঠে গিঁঠে ব্যথা বা ফুলে যাওয়া, মেরুদন্ড বাঁকা হয়ে যাওয়া (গিব্বাস) ও পেটে পানি আসা বা পেট ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

ব্র্যাক এডভোকেসি ইউনিটের সিনিয়র স্যোসাল কমিউকিকেটর মোঃ নজরুল ইসলাম জানান, সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং ব্র্যাক যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা, যক্ষ্মায় মৃত্যু ও সংক্রামনের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৪ সালে সরকার ও বেসরকারি সহযোগী সংস্থার মধ্যে একটি অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরিত হয়। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে ব্র্যাক ও মোট ৪৩টি বেসরকারি সহযোগী সংস্থা একযোগে কাজ করছে।

তিনি জানান, বিশ্বে প্রতি বছর ৮.৭ মিলিয়নের বেশি লোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ১.৪ মিলিয়ন লোক প্রতি বছর যক্ষ্মায় মারা যায়। ২২টি দেশে (High burden countries) বিশ্বের মোট যক্ষ্মারোগীর ৮০% বাস করে। যার মধ্যে মোট ৪০% যক্ষ্মারোগীই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে বাস করে।

তিনি আরো জানান, বাংলাদেশে যক্ষ্মা একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ২০১২ সালে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৬৯,৬৫৪ জন যক্ষ্মা রোগী সনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে কফে যক্ষ্মা জীবাণুযুক্ত রোগী পাওয়া গেছে ১,০৬,৭৯০ জন (সনাক্তকরণের হার ৬৯ প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায়) এবং ২০১১ সালে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচির মাধ্যমে সনাক্তকৃত ৯২% (৯৮,৮৮২ জন) রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। কফে যক্ষ্মা জীবাণুযুক্ত রোগীর কমপক্ষে ৭০% সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকৃত রোগীদের মধ্যে কমপক্ষে ৮৫ % রোগী আরোগ্য করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা (Prevalence) এবং যক্ষ্মার কারণে মৃত্যু অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে ব্র্যাক ও স্বাস্থ্য বিভাগ।

জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি মোঃ হুমায়ুন কবির খাগড়াছড়ি জেলার যক্ষ্মার বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক বলে দাবি করেন। তিনি জানান, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ব্র্যাক খাগড়াছড়ি জেলায় গণ্যমান্য ব্যক্তি, গ্রাম্য ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে যক্ষ্মা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন এডভোকেসী, গণনাটক, ফোক গান, স্কুল কুইজ ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনমূলক কাজ করে যাচ্ছে। ব্র্যাকের একটি জড়িপের বরাত দিয়ে তিনি জানান, খাগড়াছড়ি বর্তমান জনসংখ্যা ৬১৩৯১৭ জন। এই বৃহৎ জনসংখ্যাকে যক্ষ্মা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য ২৮ টি ল্যাবরেটরি ও ৪৬৪ টি কফ সংগ্রহ কেন্দ্রর মাধ্যমে ২০৪ জন স্বাস্থ্য সহকারী, ২২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীর (ব্র্যাক), ১০৭৫ জন স্বাস্থ্য সেবিকা কাজ করছে। সমগ্র জেলায় বর্তমানে চলমান যক্ষ্মা রোগী মাত্র ৪৫০ জন রয়েছে বলেও জানান তিনি। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ ও ব্র্যাক খাগড়াছড়িতে রোগীর সংখ্যা আরো কমিয়ে আনার ব্যপারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মমতাজ উদ্দিন বাহারী

প্রতিবেদক

কক্সবাজারে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে চমক থাকলেও বাড়ছে এমডিআর আতংক

মমতাজ উদ্দিন বাহারী, কক্সবাজার থেকে॥ কক্সবাজারে মরণ ব্যাধি যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এমডিআর (মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট)। জেলায় বর্তমানে এমডিআর রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ ও ব্র্যাক সূত্র নিশ্চিত করেছে। সূত্র মতে, কফ পরীক্ষায় পরও যক্ষ্মা সনাক্ত হলে তার ৬ মাস বিরতিহীনভাবে ঔষুধ সেবন করা বাধ্যতামূলক। এর ব্যতিক্রম হলেই সেই রোগীর এমডিআর হয়ে যায়। সাধারণত: চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে যক্ষ্মা রোগীর অসচেতনতা বা সেবা প্রদানকারীর অবহেলায় ঔষুধ সেবন অনিয়মিত ও অপরিমিত হলেই ওই রোগীর এমডিআর হয়। কোন কারণে এমডিআর (মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট) হলে যক্ষ্মা রোগের জন্য প্রচলিত ড্রাগ তার কোন উপকারে আসে না। এমন পরিস্থিতিতে ওই রোগীকে বিশেষ পদ্ধতিতে নতুনভাবে চিকিৎসা নিতে হয়। যা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় বহুল। তবে আশার কথা হচ্ছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় সরকার এমডিআর রোগীর চিকিৎসার ভার বহন করছে। জিও-এনজিও'র সহযোগিতায় কক্সবাজারে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ২০১৪ সালেই সহস্রাব্দ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময় ২০১৫ সালের আগে অর্জিত হয়েছে বলে কক্সবাজারের সিভিল সার্জন ডা: মোখলেছুর রহমান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, চলতি বছর যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে জেলায় সফলতার চমক থাকলেও শুধুমাত্র এমডিআর জনিত কারণে আতংক বিরাজ করছে জনমনে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও ব্র্যাকের তথ্য মতে, বর্তমানে জেলায় এমডিআর (মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট) রোগী রয়েছে ১০ জন। ২০১০ সালে এমডিআর রোগী ছিল ১ জন। ২০১১ সালেও ১ জন। ২০১২ সালে তা বেড়ে হয় ৩ জন। ২০১৩ সালে ৪ জন। ২০১৪ সালে তা বেড়ে ১০ জনে দাঁড়িয়েছে। কক্সবাজার বক্ষব্যাধি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা: আরিফুর রহমান জানান, যক্ষ্মা রোগীর এমডিআর হলে তার পেছনে সরকারের প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ বাড়ে। উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, একজন এমডিআর রোগী প্রতি বছর কমপক্ষে সুস্থ ১০ জনের মাঝে যক্ষ্মার জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া জেলায় সনাক্ত হয়নি এমন এমডিআর রোগী এখন সর্বসাধারণের জন্য আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্র্যাক কক্সবাজার জেলা ব্যবস্থাপক অজিত নন্দী জানান, দেশের সকল জেলা সদর হাসপাতাল, ৪৪টি বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিক, ৮টি বিশেষায়িত বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ৪টি বিভাগীয় হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সামরিক হাসপাতাল ও জেলখানায় বিনা মূল্যে যক্ষ্মা রোগীর পূর্ণমাত্রায় চিকিৎসা ও ঔষুধ দেয়া হচ্ছে। ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন প্রকল্পের জেলা ব্যবস্থাপক শামীন আল মামুন খানের মতে, দুর্নীতির কারণে পুষ্টিহীনতা বাড়ে। পুষ্টিহীনতার কারণে যক্ষ্মা রোগী বাড়ছে। কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা: রতন কান্তি চৌধুরী জানান, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে বসবাসকারীরা যক্ষ্মা রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে মিডিয়াসহ সংশি-ষ্ট সকলকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: সুলতান আহমদ সিরাজী জানান, জেলার ৮ উপজেলায় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ২০১৩ সালে মারা গেছেন ৩৬ জন। ২০১২ সালে এ সংখ্যা ছিল ৮৩ জন। তবে প্রতি বছরই যক্ষ্মায় অনেকে মারা যাচ্ছে। ২২,৭৬,৬৫০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত কক্সবাজার জেলায় ৩৬ জনের মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী নয়। অতীতে লোকজন আতংকে যক্ষ্মার কথা স্বীকার করতো না বলেই মৃত্যু বা আক্রান্তের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ হতো না। জনগণ বর্তমানে "যক্ষ্মা হলে রক্ষা নাই, এই কথার ভিত্তি নাই " এই শে-াগানের উপর ভরসা করে চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর আস্থাশীল হয়ে যক্ষ্মার ন্যায় ভয়াবহ রোগের কথা প্রকাশ করছে বলে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তথ্য জানা যাচ্ছে। জেলায় রয়েছে বাণিজ্যিক ভাবে তামাক উৎপাদনের বিশাল ক্ষেত্র। বলা যেতে পারে, যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান উপকরণের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের বসবাস। এতে করে যক্ষ্মাকে ছাড়তে চাইলেও যক্ষ্মা এসব লোকজনকে ছাড়ছে না।

জানতে চেষ্টা করি যক্ষ্মা কী? যক্ষ্মাকে স্থানীয় ভাবে'টিবি' রোগ বলা হয়। ইংরেজি 'টিউবারকুলোসিস' শব্দটিকে সংক্ষিপ্ত করে 'টিবি' বলে উচ্চারণ করা হয়। যক্ষ্মা একটি জীবাণুঘটিত রোগ। যা মাইক্রোব্যকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক জীবাণুর আক্রমণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যক্ষ্মা দু'প্রকারের । যেমন- ফুসফুসের যক্ষ্মা ও ফুসফুস বর্হিভূত যক্ষ্মা। এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহ বা তার অধিক সময় ধরে কাশি থাকলে ধরে নিতে হবে শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রমিত হয়েছে অর্থাৎ আপনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এই ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে কফ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে। যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ। সে কারণে তা আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে আরেক জনের শরীরে সংক্রমিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে যক্ষ্মার জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রান্ত করে। আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তাড়াতাড়ি চিকিৎসা গ্রহন করেন তা হলে যক্ষ্মার জীবাণু ছড়ানোর আশংকা থাকে না। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৪সালে সরকারি ও বেসরকারি সহয়োগী সংস্থার মধ্যে একটি অঙ্গীকারনামার আওতায় জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করার জন্য ব্র্যাকসহ ৪৩টি বেসরকারি সহযোগী সংস্থা একযোগে কাজ করছে। বর্তমানে দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করার জন্য বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে। এসব চিকিৎস্মা কেন্দ্রের মধ্যে জেলা পর্যায়ে যা সহজলভ্য তা হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্স, জেলা সদর হাসপাতাল ও কক্সবাজার বক্ষব্যাধি ক্লিনিক। বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন ব্র্যাক সূত্রে প্রকাশ, কক্সবাজার জেলায় ২০১২ সালে জেলায় আটটি উপজেলায় ২৬,৪৫৩ জনের কফ পরীক্ষা করে রোগ সনাক্ত হয়েছিল ১,৮৪৪জনের। ২০১৩ সালে জেলায় ২৮৪৬৬ জনের কফ পরীক্ষায় যক্ষ্মা সনাক্ত হয়েছে ১৮৫৩ জনের। সনাক্তকৃতদের মধ্যে চকরিয়ায় সবচেয়ে বেশী ৩৮৬জন। অপর দিকে ২০১১ সালে সনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা ছিল ১,৬৯৫ জন। চলতি ২০১৪ সালের ৩০জুন পর্যন্ত সময়ে ১৩৭২২ জনের মধ্যে কফ পরীক্ষায় ৮৯৫ জনের যক্ষ্মা সনাক্ত হয়েছে বলে ব্র্যাক সূত্রে জানা গেছে। কক্সবাজার সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: পুচনু জানান, 'ডটস্' পদ্ধতির মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগ থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে ১. যক্ষ্মার চিকিৎসা উঞ্চ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ২. এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতি দিন ঔষধ সেবন নিশ্চিত হয়। ৩. এই পদ্ধতিতে যক্ষ্মারোগীর রোগ শত ভাগ নিরাময় হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা সমূহ হচ্ছে,-১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা সহজেই উঞ্চ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

২. এই পদ্ধতিতে রোগীর হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয় না। ৩. চিকিৎসা শুরুর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদান করতে পারেন। ৪. এই পদ্ধতির মাধ্যমে মাল্টি ড্রাগ রেজিট্যান্ট যক্ষ্মা (গউজ) থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি আরো জানান, মনে রাখতে হবে যক্ষ্মা কোন বংশ গত রোগ নয়, রোগীকে ঔষধ খাওনো শুরু করলে দু' সপ্তাহ পর সাধারণত এ রোগ আর ছড়ায় না। ঠিক মত চিকিৎসা গ্রহন করলে যক্ষ্মা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন ও কাজকর্ম করতে পারে। যক্ষ্মা রোগীদের দামী খাবার না খেয়ে সাধারণত পুষ্টিকর খাবার খেলেই হয়। কক্সবাজার পৌরএলাকার মলি-ক পাড়ার মৃত লাল মিয়ার পুত্র আলী আহমদ (৭০) যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি বর্তমানে সুস্থ। তার সাথে কথা বলে জানা গেছে, বেসরকারি সংগঠন ব্র্যাক এর চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহন করে তিনি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। নিয়মিত চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছেন এ রকম অনেকের কথা জানা যায়। কক্সবাজার সিভিল সার্জন ডা: মোখলেছুর রহমান বলেন লোকজন অতীতে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলেও আতংকে তা স্বীকার করতো না। এটা ভাল লক্ষণ যে, আতংক বা ভয় ভীতি মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষ বর্তমানে জ্বরসহ কাশিতে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে বা বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে কফ পরীক্ষার জন্য আসছেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে জেলায় ৩০৪টি কফ সংগ্রহ কেন্দ্র, ১৬টি ল্যাবরেটরি রয়েছে। যেখানে ২৭৮জন স্বাস্থ্য সহকারী রয়েছেন। পাশাপাশি ব্র্যাক -এর ১৩০ জন স্বাস্থ্য কর্মী এবং ১,৪০১ জন স্বাস্থ্য সেবিকা রয়েছেন। সিভিল সার্জন আরো বলেন, এ কথা এখন বলার সময় এসেছে " যক্ষ্মা হলে রক্ষা নাই এ কথার ভিত্তি নাই"।

আবু নাছের মঞ্জু

দৈনিক
কালের ছবি
সময়ের সহযাত্রী

ঢাকা রোববার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং ॥ ১৩ আশ্বিন ১৪২১ বাংলা ॥ ৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ টাকা

নোয়াখালীতে বাড়ছে যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা

আবু নাছের মঞ্জু, নোয়াখালী : নোয়াখালীতে মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট(এমমডিআর) বা ওষুধ প্রতিরোধক যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি নানা রকম প্রচারাভিযানের পরও যক্ষ্মার ওষুধ সেবনে রোগীর অনিয়ম করার কারণে এমনটি হচ্ছে। অন্যদিকে হতদরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী তাদের ধারণাগত অস্পষ্টতার কারণে যক্ষ্মা থেকে সুরক্ষার সুযোগ কাজে লাগাতে পারছেন না।

যক্ষ্মা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের তথ্য অনুযায়ী, নোয়াখালী জেলায় ২০১৩ সালে ২৮ হাজার ৮৪১ জনের কফ পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৩৭৮ জনের যক্ষ্মা সনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪১ জনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে চিকিৎসায় অবহেলার কারণে মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট(এমমডিআর) বা ওষুধ প্রতিরোধক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন ১২ জন। ২০১১ সালে ২১ হাজার ১৯২ জনের কফ পরীক্ষা করে ২ হাজার ৫৩৩ জনের যক্ষ্মা সনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৫২ জনের মৃত্যু হয়। ২০১০ সালে ২১ হাজার ৫২৫ জনের কফ পরীক্ষা করে ২ হাজার ৬৬৪ জনের যক্ষ্মা সনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে চিকিৎসাধীন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

নোয়াখালীতে বাড়ছে

(শেষ পাতার পর)

অবস্থায় ৪৮ জনের মৃত্যু হয়। ২০০৯ সালে ২৫ হাজার ৭৯ জনের কফ পরীক্ষা করে ২ হাজার ৬২৫ জনের যক্ষ্মা সনাক্ত হয়। এর মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪৮ জনের মৃত্যু হয়।

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা কর্মসূচির নোয়াখালীর জেলা ব্যবস্থাপক মো.. আতিকুর রহমান জানান, মাঠ পর্যায়ে তাদের স্বাস্থ্য কর্মীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ সত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের চিকিৎসায় গাফিলতি ও অনিয়মের করেন। যার কারণে জেলায় গত পাঁচ বছরে মধ্যে ২০১৩ সালে সর্বাধিক ১২ জন মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট(এমমডিআর) রোগী সনাক্ত করা হয়। যক্ষ্মার চিকিৎসা চলাকালে রোগী যদি কার্যকর বিধি অনুযায়ী ওষুদ গ্রহণ না করে অথবা ওষুধ গ্রহণের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেয়, তবে প্রয়োগকৃত ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। এর ফলে যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রচলিত ওষুধ আর কাজ করতে চায় না। এটিকে ওষুধ প্রতিরোধক যক্ষ্মা বা মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট যক্ষা বলা হয়ে থাকে।

নোয়াখালী সদর উপজেলার পূর্ব অশ্বদিয়া গ্রামের মুজাফর আহম্মদ (৫০) ২০১২ সালে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে ব্র্যাকের তত্ত্বাবধানে তার ৬ মাসের চিকিৎসা চলে। ওষুধ সেবনের পর মুজাফরের কফ পরীক্ষা করা হলে তার শরীরে দ্বিতীয় বার যক্ষার জীবানু ধরা পড়ে। পিতার কাছ থেকে যক্ষায় আক্রান্ত হন মুজাফরের মেয়ে শিরিন আক্তার(২২)। শিরিনের শরীরেও দ্বিতীয় বার এই রোগের জীবানু ধরা পড়ে। এ ব্যাপারে নোয়াখালী বক্ষব্যাধী ক্লিনিকের কনসালটেন্ট কামাল উদ্দিন জানান, এমডিআর রোগী থেকে আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীর ক্ষেত্রেও যক্ষ্মার সাধারণ চিকিৎসায় কাজ হয় না।

কবিরহাট উপজেলার মো. হানিফের ছেলে বেলাল হোসেনের (৩৩) ২০১২ সালের জুলাই মাসের ৯ তারিখে যক্ষ্মার চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা চলাকালে ২ মাস, ৫ মাস ও ৬ মাস পর তিনবার তার কফ পরীক্ষা করা হলে প্রতিবারই যক্ষার জীবানু ধরা পড়ে। এরপর ঢাকা ও চট্রগ্রামে তার কফের কালচার করা হয়। বর্তমানে তিনি চট্রগ্রামে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহের অধিক সময়ব্যাপী কাশি যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ। যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগী বিনাচিকিৎসায় থাকলে তার কফ কিংবা হাঁচি-কাশির মধ্য দিয়ে যক্ষারোগের জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সুস্থ্য ব্যক্তিকে আক্রান্ত করতে পারে। এ সব সাধারণ তথ্য না জানার কারণে দুর্গম চর, বস্তি ও ঘরবসতিপূর্ণ এলাকায় যক্ষ্মায় আক্রোন্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে।

নোয়াখালীর ৯ উপজেলায় ২৪০টি কেন্দ্রে যক্ষারোগ সনাক্তকরণের জন্য বিনামূল্যে কফ সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহীত কফ পরীক্ষার জন্য রয়েছে ২১টি ল্যাবরেটরি। এসব কার্যক্রম পরিচালনায় ৩১৫ জন স্বাস্থ্য সহকারী এবং ব্র্যাকের ১৬০ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও ১ হাজার ৬০০ জন স্বাস্থ্য সেবিকা নিয়োজিত রয়েছেন। যেখানে বর্তমানে ১ হাজার ৮৫০ জন যক্ষা রোগীর চিকিৎসা চলমান রয়েছে।

যক্ষ্মা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃস্টির লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারিভাবে আলোচনা, গোলটেবিল বৈঠক, গণনাটক ও লোকসংগীত পরিবেশন, পোষ্টার, লিফলেট, ষ্টিকার ও বিলবোর্ড স্থাপন সহ নানা রকম কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নোয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায় যক্ষ্মা বিষয়ক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত দুই বছরে গ্র্যাজুয়েট ডাক্তারদের নিয়ে ৮৫টি সভা, গ্রাম ডাক্তারদের, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আরোগ্য রোগীদেরকে নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে ৬৩টি সভা করা হয়। গণনাটক প্রদর্শিত হয় ৬৩টি, কারখানা শ্রমিকদের ১৪টি সভা, স্কাউটদের তিনটি সভা, নারীনেত্রীদের সাতটি সভা এবং জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক, চিকিৎসক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনকে নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক করা হয়।

এতসব আয়োজনের পরও সামাজিক অসচেতনাতার কারণে জেলার দুর্গম চর ও বস্তি এলাকায় যক্ষা সম্পর্কে মানুষের ধারণাগত অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। জেলার হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ, সদর ও কবিরহাট উপজেলায় নানা শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে আলাপকালে জানা যায়, যক্ষ্মা সম্পর্কিত অসচেতনতা এবং এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে এ রোগ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি সুযোগ সুবিধা সমূহ কাজে লাগাতে পারছে না তৃণমূল জনগোষ্ঠী। যার কারণে এক সময়ের দুরারোগ্য ব্যাধী যক্ষা এখনো জেলার অসংখ্য মানুষের ধারনায় সুকঠিন রূপ ধারণ করে আছে। বিনামূল্যে কফ পরীকার মাধ্যমে যক্ষ্মরোগী সনাক্ত করা এবং এর চিকিৎসা দেয়ার বিষয়টি জানা নেয় হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দুর্গম চরের অনেকের।

হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেহেরাজ উদ্দিন জানান, দ্বীপের বেশির ভাগ মানুষ নিরক্ষর। যক্ষ্মা নিয়ে সচেতনতা মূলক প্রচলিত বার্তা দ্বীপবাসীকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভালো ফল দিচ্ছে না। এজন্য স্থানীয় ভাষায় যক্ষ্মা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তিনি। হাতিয়া মৎস্যজীবী সমিতির সভাতি হেলাল উদ্দিন জানান, সমুদ্রগামী মৎস্যজীবী, মাছ ব্যবসায়ী ও জেলে পাড়ায় যক্ষ্মা সম্পর্কে যথেষ্ট অসচেতনতা রয়েছে। নিম্ন আয়ের এসব মানুষ ব্যয় বহুল বেসরকারি চিকিৎসা সেবা নিতে পারছে না। অন্যদিকে না জানার কারণে সরকারি বেসরকারিভাবে বিনামূল্যে যক্ষ্মার চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

যক্ষ্মা লক্ষণ, কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানা নেই সুবর্ণচর উপজেলার চরক্লার্কের কৃষক আমির হোসেনের (৬০)। যার কারণে নিজ বাড়ি ও এলাকার অনেকেই মাসের পর মাস কাশিতে ভুগলেও কফ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি কখনো। কাশি নিয়ে মৃত্যু হলেও কাশির মূল কারনটা জানা হয়নি অনেকের। সদর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের জালিয়াল গ্রামের নূর মোহাম্মদ জানান, যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কফ পরীক্ষা করতে হয় বলে জানা আছে তাঁর। তবে, এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে ভালো জানা নেই।

নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সভাপতি আলমগীর ইউসুফের মতে, যক্ষ্ম নির্মূলে সামাজিক সচেতনতায় সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরী। যক্ষ্মা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনঅংশগ্রহণে সহজ ও কার্যকর প্রচারাভিযান দরকার। উদ্বুদ্ধকরণ ও সামাজিক সচেতনতা একজন যক্ষ্মরোগীর নিরাময়ে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। যক্ষ্মা মানেই যে নিশ্চিত মৃত্যু নয়, নিয়মীতি ওষুধ সেবনের মধ্যদিয়ে একজন যক্ষারোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে; এসব তথ্য পৌছে দিতে হবে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মাঝে।

নোয়াখালীর সিভিল সার্জন ডা. মো. দোলোয়ার হোসেন জানান, প্রত্যন্ত এলাকায় সন্দেহভাজন যক্ষ্মা রোগীর কফ পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃস্টির লক্ষ্যে সরকারে পাশাপাশি সকলকে এগিয়ে আসতে হবে বলে অভিমত দেন তিনি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা সংক্রামণের হার ও যক্ষ্মাজনিত মৃত্যুহার অর্ধেকে কমিয়ে আনার বিষয়ে অঙ্গিকারবদ্ধ। সরকারের এই অঙ্গিকার বাস্তবায়নে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর সচেতনা ও অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। আর এ জন্যে যক্ষ্মা বিষয়ক প্রচলিত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার কার্যক্রমকে আরো বেশি জনবান্ধন করে তোলার বিষয়টি ভাবনায় আনা দরকার বলে বলে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

brac

ব্র্যাক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫
বিভাগঃ সিলেট

প্রথম পুরস্কারঃ আদেব মাহমুদ চৌধুরী
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ নাই
তৃতীয় পুরস্কারঃ নাই

সাপ্তাহিক সুনামগঞ্জের কথা

আবেদ মাহমুদ চৌধুরী

যক্ষায় সাফল্য আসলেও জেলায় এমডিআর রোগীর সংখ্যা বাড়ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

দূর হচ্ছে যক্ষা ভীতি। সুনামগঞ্জ স্বাস্থ্য বিভাগ ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের যৌথ প্রচেষ্টায় যক্ষা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। যক্ষা একটি প্রাচীন রোগ। পূর্বে এ রোগের কোন চিকিৎসা ছিলনা। বর্তমানে এ রোগের চিকিৎসা আছে। যক্ষা সম্পর্কে একটি কুসংস্কার আছে। এটা বংশগত রোগ নয়। বর্তমানে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সমাজ থেকে এ কুসংস্কার দূর হচ্ছে। যক্ষার চিকিৎসা এখন মানুষের হাতের নাগালে চলে এসেছে। সব পরীক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে এখন বিনামূল্যে।

ব্র্যাক জেলা ব্যবস্থাপক মিটু রঞ্জন সরকারের কাছ থেকে জানা যায়, সরকারের ৪৩৫ জন স্বাস্থ্য সহকারী এবং ব্র্যাকের বেতনভূক্ত ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও ১৭৭১ জন স্বাস্থ্য সেবিকা ফিল্ড পর্যায়ে যক্ষা রোগী সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদানে কাজ করছে। ২০০৩ সাল থেকে সরকারের সাথে ব্র্যাক যৌথভাবে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে আসছে। বর্তমানে এ জেলার ১১টি উপজেলার ৩৪৮টি স্থান থেকে যক্ষা রোগীর কফ সংগ্রহ করে ১৪টি ল্যাবের মাধ্যমে কফ পরীক্ষা করে সনাক্তকৃত রোগীদের বিনামূল্যে যক্ষার চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ব্র্যাক জেলা অফিস সূত্রে আরো জানা যায়, ২০১৩ সালে মোট ৩৫১৯৬ জন রোগী কফ পরীক্ষা করে ২৩৫৫ জন যক্ষা রোগী সনাক্তকরণ করা হয়েছে এবং এদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে চলমান রোগীর সংখ্যা ২৬৭০ জন। সুনামগঞ্জ জেলা শহরে সরকারী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে বিনামূল্যে যক্ষা সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। যক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারিভাবে হাটবাজারে গণনাটক লোকসঙ্গীত পরিবেশন ও লিফলেট স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে যক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন বাণী ও শ্লোগান দিয়ে। জেলা পর্যায়ে ডাক্তার, নারীনেত্রী, স্কাউট ফ্যাক্টরী, শ্রমিক ও সংবাদকর্মীদের নিয়ে সভা সেমিনার করা হচ্ছে। এতকিছুর পরও দিন দিন যক্ষা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সামাজিক ও অসচেতনতার কারণে এমটি হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সাধারণ যক্ষায় আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচিকাচি ও থু থু থেকে বাতাসের মাধ্যমে যক্ষার জীবানু ছড়ায়। একজন যক্ষা রোগী জীবদ্দশায় ১০ জন সুস্থ মানুষকে যক্ষায় সংক্রমিত করতে পারে। এসব তথ্য না জানার কারণে যক্ষায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

যক্ষা রোগের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্য সেবিকা, রোগীর পরিবারের সদস্যদের একাগ্রতা প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

(গউজ) যক্ষা খুবই ভয়ানক। রোগী যদি নিয়মিত ঔষধ সেবন না করে তাহলে সে পুনরায় যক্ষায় আক্রান্ত হতে পারে। সেটিকে বলে মাল্টি ড্রাস রেজিস্ট্যান্ট যক্ষা বা গউজ এঞই । মাল্টি ড্রাস রেজিস্ট্যান্ট এটি মানুষের তৈরি ঘটনা। ও নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করলে চিকিৎসার ক্যাটাগরি ভুল করলে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট এঞই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গউজ এমন একটি অবস্থা যেখানে যক্ষা রোগের চিকিৎসা প্রধান দুটি ঔষধই (রিফামপিসিন ও আইসোনিয়াজাইড) জীবাণুর বিরুদ্ধে আর কাজ করেনা। প্রচলিত ঔষধ ব্যবহার করে লাভ হয়না। তখন এর চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদী হয়।

গউজ টিবি হলে কফ কালচার (Cough culture) ও ড্রাগ সেনসিটিভিটি টেষ্ট (উঝঞ) এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে হয়। তবে ঢাকার মহাখালী রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলাদেশে আর কোথাও এই পরীক্ষা করা যায় না। তবে নির্দিষ্ট জেলা পর্যায়ে এবহব ঢঢ়বৎঃ এর মাধ্যমে গউজ টিবি দ্রুত সনাক্তকরণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গউজ এঞই রোগীর চিকিৎসা সময়কাল মোট ২৪ মাস এবং এই সময়কে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। Intensive Phase- প্রথম ৬ মাস। এই সময়ে রোগী হাসপাতালে ভর্তি থেকে নিয়মিত চিকিৎসা নিতে হবে। পরবর্তী ১৮ মাসকে বলা হয় Ontinuation Phase। এই সময়ে রোগী নিজ নিজ এলাকার দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য সেবিকা/ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে নিয়মিত ঔষধ সেবন করবে। এমডিআর-টিবি রোগীর ঔষধ খাওয়ার পর কোন সমস্যা হলে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোন ঔষধ খাওয়ানো যাবে না এবং ঔষধ খাওয়ার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে টিবির ঔষধ খাওয়া বন্ধ না করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। রোগীর প্রতি মাসে ফলোআপ কফ মাইক্রোসকপি পরীক্ষা করতে হবে এবং ৩ মাস অন্তর কফ কালচার করার জন্য ঢাকায় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। সরকার ব্র্যাক ও সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গউজ রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সুনামগঞ্জ জেলার জানীগাঁও গ্রামে লক্ষণশ্রী ইউনিয়নের মো. রিপন মিয়া বয়স ১৯, পিতা জিয়া উদ্দিন। তিনি অসাবধানতার কারণে যক্ষায় আক্রান্ত হন। তিনি নিয়মিত পূর্ণমেয়াদে যক্ষার ঔষধ সেবনের ফলে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

সুরমা ইউনিয়নের ইব্রাহীমপুর গ্রামের বাসিন্দা আমজাদ আলী বয়স ৪৪, পিতা মৃত ময়না মিয়া। তিনি ২০১৩ সালে ঔষধ সেবন শুরু করেন। ঔষধ সেবন চলাকালীন সময়ে ২ মাসের ৫ মাসের এবং ৬ মাসের কফ পরীক্ষা করা হয়। কফ পরীক্ষায় কোন জীবাণু না থাকায় তাকে ডাক্তার ধারা Cured ঘোষণা করা হয়।

পৌরসভার ওয়েজখালী গ্রামের মো. আরজ আলী বয়স ৭০ পিতা মৃত কুতুব উদ্দিন তিনি যক্ষায় আক্রান্ত হন। তাহার চিকিৎসাকালীন সময়ে আড়াই মাসের মাথায় তিনি মারা যান। কারণ তার তিনি রোগটিকে ভারী করে ডাক্তারের নিকট আসেন। চিকিৎসা সময়মত না করে অসময়ে নিয়ে আসার কারণে তার প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

সুনামগঞ্জ জেলার গৌরারং ইউনিয়নের জগারগাঁও গ্রামের মো. তোফাজ্জল হোসেন বয়স ৩৮ ২০১৩ সালে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন। তাহার অসাবধনার কারণে তার স্ত্রী ৩০ এবং মেয়ে ৫ বছর তাহার নিকট হইতে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়।

মোছা. তাছলিমা আক্তার ১৮ স্বামী মো. হোসেন আলী গ্রাম মহিমপুর, ইউনিয়ন সুরমা তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নিয়মিত পূর্ণমেয়াদে ঔষধ সেবন করায় এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

ব্র্যাকের সুনামগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মো.মনিরুজ্জামান বলেন, 'যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণের বড় সমস্যা হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। দেশের সমাজ ব্যবস্থা এখনো সেভাবে গড়ে উঠেনি, আশানুরূপ সচেতনতা বৃদ্ধি পায়নি। বাংলাদেশের যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বিভিন্ন বিদেশী সহায়তায় সরকার ব্র্যাকের মাধ্যমে সুনামগঞ্জে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।' তিনি বলেন, 'প্রতিবছর যক্ষ্মা রোগে বিশ্বের প্রায় ৯০ লাখ লোক আক্রান্ত হচ্ছে। প্রায় ১৪ লাখ লোক প্রতি বছর মারা যায়। বিশ্বের ২২ টি দেশে ৮০ ভাগ যক্ষ্মা রোগীর বসবাস, এই রোগীর ৪০ ভাগই দক্ষিণপুর্ব এশিয়া অঞ্চলে বাস করে। ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মার কারণে মৃত্যু সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনার জন্য জোরালো চেষ্টা চলছে। যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রনে প্রতিবছরই ব্র্যাক ও সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে দেশের সকল গণমাধ্যমেই প্রচারণা চালানো হচ্ছে। রেডিও টেলিভিশনে টক শোর আয়োজন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, গোল টেবিল বৈঠক, সাংবাদিকদের সরেজমিনে প্রতিবেদন, সভা সেমিনার সমাবেশ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রনের ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রচার, দেশের জনপ্রিয় কবি সাহিত্যিক, অভিনেতা, নাট্যকার ও জনপ্রতিনিদের নিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে নিয়মিত।

বড়াব্যাধি ক্লিনিকের মেডিকেল অফিসার ডা. নূরন্নল ইসলাম বলেন, 'আমি যখন বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে যোগদান করি। তখন আমার পরিবার, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু মহলের অনেকেই আমাকে বলেছিলেন, এখানে থাকলে আমিও নাকি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে যাব। একথা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ আমিসহ ক্লিনিকের সবাই বর্তমানে সুস্থ আছি, রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি। যক্ষা হলে রক্ষা নেই, একথা মোটেও সঠিক নয়, নিয়মিত ঔষধ খেলে যক্ষা রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব।' তবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর লোকজনের যক্ষা রোগ হওয়ায় সম্ভবা বেশী থাকে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সিভিল সার্জন ডা. নিশিত নন্দী মজুমদার বলেন, 'যক্ষ্মা কোন বংশগত রোগ নয়, নিয়মিত ঔষধ খেলে ও চিকিৎসা গ্রহণ করলে যক্ষা সম্পুর্ন ভাল হয়ে যায় এবং রোগী স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেন। সিলেট বিভাগের ৪ জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জের যক্ষা রোগের অবস্থা খুবই খারাপ বর্তমানে তা আরো ভয়াবহ রুপ ধারণ করছে। কারো যক্ষা রোগের পরীড়্গা নিরিড়্গার জন্য ৫ হাজার টাকা খরচ করতে হয়না। একদম বিনামূল্যে সব ধরণের পরীক্ষা-নিরিক্ষা এমনকি রোগীর সকল যাতায়াত ভাড়া প্রদান করা হয় ।' তিনি আরো বলেন, 'অনেক যক্ষা রোগী কিছুদিন ঔষধ খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর আর ঔষধ গ্রহণ ও চিকিৎসা সেবা নিতে চান না। এসব রোগীদের টানা ৬ মাস ঔষধ সেবন ও নিয়মিত চিকিৎসা করলে এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। এমডিআর ভয়াবহ রোগ এই রোগ একজন থেকে বছরে ১০ জনের মধ্যে সংক্রমিত হয়। তাই এমডিআর রোগের ব্যাপারে রোগীকে ও পরিবারের সদস্যদের আরো বেশি করে সচেতন হতে হবে। বর্তমানে এমডিআর রোগীদের নিয়মিত ঔষধ খাওয়ানোর জন্য একজন ডটস প্রোভাইডার নিয়োগ করা হচ্ছে। তাকে প্রতিমাসে ১৮'শ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে। যাতে করে কোন রোগী ঔষধ খাওয়ার ব্যাপারে কোন ফাঁকি দিতে না পারে। কারণ অনেক সময় যক্ষায় আক্রান্ত রোগী বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেন।'

brac

ব্র্যাক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫
বিভাগঃ রংপুর

প্রথম পুরস্কারঃ আজহারুল আজাদ জুয়েল
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ জিনাত রহমান
তৃতীয় পুরস্কারঃ মোঃবাপ্পী রহমান

দৈনিক বাংলাদেশ সময়

আজহারুল আজাদ জুয়েল

ভয়ঙ্কর যক্ষ্মা এমডিআর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চাই সচেতনতা

রোগবালাই

আজহারুল আজাদ জুয়েল

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মমতাজ আলী একজন চাকরিজীবী। বাড়ি দিনাজপুর জেলা সদরের শশরা-সোনাহার পাড়ায়। ১ ছেলে ও ১ মেয়ের জনক মমতাজ হঠাৎ করেই প্রবল জ্বর, প্রচণ্ড বমি ও কাশির শিকার হলেন। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো দিনাজপুরের প্রখ্যাত চিকিৎসক, দিনাজপুর পরমাণু চিকিৎসা কেন্দে র পরিচালক ডা. বি কে বোসের কাছে। তিনি ব্যবস্থাপত্র দিলেন। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া হলো। কিন্তু রোগের উপশম হলো না।

এরপর নিয়ে যাওয়া হলো দিনাজপুরের আর এক প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. সান্তনু বসুর কাছে। তিনিও ওষুধ দিলেন। কিন্তু কাজ হলো না। অবস্থার অবনতির প্রেক্ষিতে ভর্তি করা হলো দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কয়েক দিন চিকিৎসা হলো হাসপাতালে। কিন্তু রোগীর অবস্থার তেমন উন্নতি হলো না।

হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে সন্দেহ করা হলো যে, রোগীর এটা সাধারণ জ্বর-কাশি নয়, অন্য কিছু হয়েছে। সন্দেহেরবশে চিকিৎসকের পরামর্শে ০৭. ০৭. ১৪ ইং তারিখে তার কফ পরীক্ষা করা হলো ব্র্যাক পেরিফেরাল ল্যাবরেটরিতে। পরীক্ষায় তার শরীরে যক্ষ্মা ধরা পড়ে। এরপর রোগীকে কিছু প্রশ্ন করা হলো। তাতে তিনি জানালেন যে, ৪/৫ বছর আগে তার যক্ষ্মা হয়েছিল। তখন ডট পদ্ধতির চিকিৎসায় ভাল হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সন্দেহ হয় ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও চিকিৎসকদের। তাদের সন্দেহ হয় যে, এই রোগী তখন যক্ষ্মা রোগ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। পুরো সুস্থ না হয়েই সম্ভবত ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবত ওই যক্ষ্মা এখন এমডিআর যক্ষ্মায় পরিণত হয়েছে।

এমডিআর (MDR) হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায় একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে। দিনাজপুরে এই পরীক্ষা হবে না, যেতে হবে রংপুরে। চিকিৎসক এবং ল্যাবসংশ্লিষ্টরা তাকে পাঠালেন রংপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে। সেখানে অত্যাধুনিক মেশিনে তার জিন এক্সপার্ট পরীক্ষা হলো। ১৪. ০৮. ১৪ ইং তারিখে পরীক্ষা করলেন রংপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট মাহবুব আলম। পরীক্ষায় মমতাজের শরীরে MDR যক্ষ্মা ধরা পড়ল। অর্থাৎ সবাই যে আশঙ্কা করছিলেন সেটাই সত্য প্রমাণিত হলো।

MDR ধরা পড়ার পর চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঢাকায় মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পাঠানো হলো। সেখানে তাকে ভর্তি করা হলো ১৯. ০৮. ১৪ ইং তারিখে। এখন সেখানে তার চিকিৎসা চলছে এবং ২৯. ০৮.১৪ ইং তারিখে যখন আমি এই লেখা লিখছি তখন মমতাজ আলীর স্ত্রী মিনারা পারভীনের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলে জেনেছি যে, রোগী বেশ ভাল আছেন। তার বমি বন্ধ হয়েছে এবং তিনি খেতে পারছেন।

মিনারা জানালেন, মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালের যে কক্ষে মমতাজ আলীকে নিয়ে তিনি আছেন, সেই কক্ষে আরো ১৩ জন রোগী আছেন যারা এমডিআর যক্ষ্মায় আক্রান্ত। এই হাসপাতালে প্রতিদিন অনেক এমডিআর রোগী আসছেন এবং এমার্জেন্সিতে প্রতিদিনই এক/দু'জন রোগী মারা যাচ্ছেন। মৃত্যুর কারণ হলো রোগীকে চরমতম খারাপ অবস্থায় নিয়ে আসা।

এমডিআর টিবির পুরো অর্থ হলো 'মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিবি'। যার বাংলা 'ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা'। বিশেষজ্ঞদের মতে এমডিআর এমন একটা অবস্থা যেখানে যক্ষ্মার সাধারণ চিকিৎসায় কোনো কাজ হয় না।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক ও প্রশাসক ডা. মো. আমির আলী বলেন, এমডিআর যক্ষ্মা অতীব ভয়ঙ্কর। একজন সাধারণ যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসায় সরকারের খরচ হয় ১২ হাজার টাকা। সময় লাগে ৬ মাস। কিন্তু একজন এমডিআর রোগীর চিকিৎসায় খরচ হয় ৪ লাখ টাকা, সময় লাগে ২২ মাসের বেশি। এমডিআর চিকিৎসায় রোগীকে কমপক্ষে দেড় মাস হাসপাতালেই শুয়ে থাকতে হয়। এ সময় হাসপাতালের বাইরে তাকে যেতে দেয়া হয় না কারণ বাইরে থাকলে তার মাধ্যমে যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়তে পারে। একজন এমডিআর যক্ষ্মা রোগী অন্যের দেহে যে যক্ষ্মা ছড়ায় সেটাও এমডিআর। সে কারণে এই রোগীরা বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর।

ডা. আমির যে কোনো ব্যক্তির যক্ষ্মা শনাক্ত হওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসা শুরু এবং যতদিন প্রয়োজন ততদিন নিয়মিত ও সময়মত ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন। তার মতে, যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর রোগী যদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে গাফিলতি করেন, ওষুধ খাওয়ার

বেলায় অনিয়ম করেন, কোনোদিন ওষুধ খেলেন তো কোনোদিন খেলেন না, চিকিৎসা চলতে চলতে ভাল হয়ে গেছেন মনে করে ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেন, তাহলে পরবর্তীতে তার এমডিআর বা ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এমডিআর হওয়া মানে রোগীর নিজের, তার পরিবারের ও সমাজের জন্য এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া, বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখী হওয়া।

বাংলাদেশে বিনামূল্যে যক্ষ্মার উন্নত চিকিৎসা আছে। যক্ষ্মা রোগীদের যক্ষ্মা শনাক্তকরণে যত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় এবং যক্ষ্মা শনাক্ত হলে যত রকম চিকিৎসা রয়েছে তার সবকিছুই বিনামূল্যে বা সরকারি খরচে দেয়া হয়। রোগীর শুধু কাজ হলো নিয়মিত, সময়মত, পরিমাণমত ওষুধ সেবন করে যাওয়া। এখানে গাফিলতি চলবে না। গাফিলতির অর্থ হলো MDR যক্ষ্মাকে আমন্ত্রণ জানানো। মমতাজ আলীর ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।

কিছু কিছু সাধারণ যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসাজনিত অবহেলার কারণে ইদানীং এমডিআর বাংলাদেশে বড় ধরনের সমস্যা হয়ে উঠেছে। ২০১৩ সালে দিনাজপুর জেলায় এমডিআর ছিল না। কিন্তু ২০১৪ সালে মমতাজসহ ৩ জন এমডিআর যক্ষ্মা রোগী পাওয়া গেছে। অন্য দুই জনের একজনের বাড়ি ফুলবাড়ী উপজেলায়, আরেকজনের বাড়ি চিরিরবন্দর উপজেলায়। দিনাজপুরের ব্র্যাক-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক চিত্তরঞ্জন হাওলাদার জানান, দিনাজপুরে এই মুহূর্তে ৩ জন এমডিআর যক্ষ্মা রোগী আছেন এবং সকলেই চিকিৎসার মধ্যে রয়েছেন।

দিনাজপুরের সিভিল সার্জন ডা. মো. মোশায়ের-উল-ইসলাম বলেন, এমডিআর নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশের ১৮ জেলায় অত্যাধুনিক জিন এক্সপার্ট মেশিন রয়েছে। সরকার বিনামূল্যে এই সব মেশিনে এমডিআর যক্ষ্মা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই চিকিৎসক কিংবা টেকনোলজিস্টরা সন্দেহ প্রকাশ করা মাত্র প্রত্যেক রোগীর উচিত তার এমডিআর যক্ষ্মা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া। পরীক্ষায় MDR যক্ষ্মা পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা শুরু করতে হবে। তা না হলে ঐ রোগীর মাধ্যমে অন্যের শরীরেও MDR ছড়িয়ে পড়বে।

এমডিআর এড়ানোর কোনো উপায় আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে দিনাজপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের কনসালট্যান্ট ড. মাস্তুরা বেগম বলেন, যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীরা যদি যক্ষ্মার চিকিৎসা গ্রহণকালে কোনো ধরনের গাফিলতি না করেন, নিয়মিত ওষুধ গ্রহণে অবহেলা না করেন তাহলে এমডিআরসহ সব ধরনের যক্ষ্মা প্রতিরোধের সেটাই হবে সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম উপায়।

তিনি জানান যে, যক্ষ্মা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সকলের হচ্ছে। চিকিৎসার আওতায় আসার পর কেউ কেউ অবহেলা করছেন। এর ফলে এমডিআর যক্ষ্মা চলে আসছে। আমরা যদি সচেতন না হই, যদি যক্ষ্মা ও এমডিআর মোকাবেলায় নিজেরা সতর্ক না থাকি তাহলে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে আমাদের সবাইকে। বাংলাদেশে যক্ষ্মা একটা বড় ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা। এটা এক ধরনের সামাজিক সমস্যাও। এক সময় যক্ষ্মাকে ক্ষয়রোগ বলা হতো এবং যক্ষ্মা মানে অনিবার্য ক্ষয় বা মৃত্যু বলে গণ্য করা হতো। যার আছে যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা এভাবেও কেউ কেউ এর ভয়াবহতা তুলে ধরতেন।

কিন্তু গত দুই দশকে সরকারের বিভিন্ন হিতকর উদ্যোগ, বেসরকারি সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে পরিস্থিতির অনেক উত্তরণ ঘটেছে। এখন যক্ষ্মায় মৃত্যুহার খুব কম। তারপরেও একথা সত্য যে, নানান উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনো প্রতিবছর প্রায় দুই লাখ লোক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং এই রোগীদের মধ্যে চিকিৎসায় অবহেলাজনিত কারণে পরবর্তীতে কেউ কেউ MDR যক্ষ্মার শিকার হচ্ছেন। এটা যক্ষ্মা প্রতিরোধে বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি ও সাফল্য এবং সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অথচ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কঠিন কিছু নয়। আমরা জানি যে, সরকার যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় সফলতা অর্জনের জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে ব্র্যাকসহ বেসরকারি সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালাচ্ছে। এই কার্যক্রমের বেশ কিছু টার্গেট ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে এবং আরেকটি অন্যতম টার্গেট হলো ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মাজনিত মৃত্যু হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা। কিন্তু MDR যক্ষ্মার সাম্প্রতিক ব্যাপকতা এক্ষেত্রে আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকার যে সমন্বিত কার্যক্রম চালাচ্ছে তার আওতায় সারা দেশে বিপুলসংখ্যক চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, ল্যাব কর্মী, সেবিকা, স্বেচ্ছাসেবক, সমাজকর্মী একটি গঠনমূলক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশজুড়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধমূলক কাজে সংযুক্ত রয়েছেন। যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীরা যদি এইসব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, ল্যাব কর্মী, সেবিকা, স্বেচ্ছাসেবক, সমাজকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী চলেন তাহলে এমডিআর হওয়ার সম্ভাবনা যেমন থাকবে না, তেমনি সাধারণ যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও কমবে এবং যে চ্যালেঞ্জ এসেছে তা মোকাবেলা করাও সহজ হবে। আমরা আশা করব যক্ষ্মা রোগীসহ সর্বস্তরের মানুষ তেমন সম্ভানার দিকেই এগিয়ে যাবে।

দৈনিক উত্তর বাংলা

জিনাত রহমান

যক্ষ্মা হলে রক্ষা নেই এখন এই কথার কোন ভিত্তি নেই

॥ জিনাত রহমান ॥

যোগাযোগ একটি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম। সমাজের সকল স্তরের সদস্যদের সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে আচরণের আমূল পরিবর্তন এবং সমাজের সার্বিক উন্নতি করা সম্ভব। বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে এই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য যোগাযোগের কার্যকরী কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে যক্ষ্মা রোগীর যদি নিয়মিত সঠিক মাত্রায় চিকিৎসা দেয়া যায় তাহলেই যক্ষ্মা রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়। জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা সাফল্যের হার বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখা যাবে। সুস্থ্য মেধাবী এবং কর্মক্ষম জনশক্তির মাধ্যমেই কেবল একটি জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব। উন্নত পরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চার মাধ্যমে রোগমুক্ত সুস্থ্য সবল জাতি গঠন সম্ভব। বাংলাদেশে চিকিৎসা সাফল্যের হার সন্তোষজনক হলেও রোগ নির্ণয়ের হার আশাব্যঞ্জক নয়। সামাজিক অসচেতনতা এবং যক্ষ্মা সম্পর্কিত সঠিক তথ্যের অভাব, যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের হার বৃদ্ধিতে বড় রকম বাধা। এই লক্ষ্য নিয়ে সরকার ও ব্র্যাক ডটস পদ্ধতিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষায় যেসব বিধি পালন করা হয়। আর এটা তখনই সম্ভব যখন জনসাধারণের কাছে স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক তথ্য থাকবে যা সকল বিষয়ে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবেলা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন দেশের জনগণের বর্তমান স্বাস্থ্য অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কী এবং কিভাবে বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি হয় সে সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। রোগ হলে একজন মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যহত হয়। একজন ছাত্রের লেখাপড়া যেমন ব্যহত হয় তেমনি কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। আবার সংক্রমক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে তা অন্যজনের দেহে সংক্রমিত হলে মহামারী আকার ধারণ করতে পারে। রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসার প্রয়োজনে অর্থের বিষয়টি চলে আসে। অনেকে অর্থের অভাবে সুষ্ঠু চিকিৎসা করতে পারে না। অনেক সময় অসুস্থ্য এবং রোগাক্রান্ত মানুষের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতা কমে যায়। ফলে দেশের সার্বিক তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যহত হয়।

বর্তমানে যক্ষ্মা বাংলাদেশের প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। তাই সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও ব্র্যাক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার ৫০% যক্ষ্মা জীবাণু দ্বারা সংক্রমতি। প্রতিবছর যক্ষ্মার কারণে ৭০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। বিশ্বের যে ২২টি দেশের যক্ষ্মা রোগের সংখ্যা সর্বাধিক বাংলাদেশ তার মধ্যে ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। যক্ষ্মা একটি জীবাণু ঘটিত রোগ। যা মাইক্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউবার কুলোসিস যক্ষ্মা জীবাণু নামক জীবাণু দিয়ে হাচি বা কাশির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে থাকে। যক্ষ্মা রোগীর কফ, হাচি, কাশির মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বের হয়ে বাতাশে মিশে ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ্য ব্যক্তির ফুসফুসে ঢুকে বংশ বৃদ্ধি করে। একজন যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসা ছাড়া সারা বছর ১০ জন সুস্থ লোককে আক্রান্ত করতে পারে। এভাবে সে তার পরিবার ও তার আশে পাশের মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। তাই একজন মায়ের যক্ষ্মা হলে, সহজেই তার মায়ের মাধ্যমে শিশু-সন্তানটি জীবাণুতে আক্রান্ত হতে পারে।

ফুসফুসে যক্ষ্মার লক্ষণগুলি হল, এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহের বেশী সময় কাশি, বুকে ব্যাথা, খাবারে অরুচি, শ্বাস কষ্ট এবং ওজন কমে যাওয়া এটা ধরে নিতে হবে। তিন সপ্তাহের বেশী কাশি থাকলেই সেই ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী বলে সন্দেহ করতে হবে।

নিয়মিত পরিমিত ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঔষুধ সেবনের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্ণ ভাবে ভাল হয়। অনিয়মিত অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ চিকিৎসা করলে এ রোগ থেকে পুরোপুরি আরোগ্য হওয়া যায় না। তাই সরকার ও ব্র্যাক যৌথভাবে কাজ করতে যেয়ে তারা দেখেছে রোগীরা ওষুধ ঠিকমত খায়না, তাই সেবিকাদের মাধ্যমে এই ডটস চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করায় অনেক সুফল বয়ে এনেছে। রোগীরা দ্রুত সুস্থ্য হচ্ছে।

১৯৯৩ সালে দেশজুড়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে কাজ করার জন্য সরকার ও বেসরকারী সংস্থা সমূহ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বেসরকারী সংস্থা সমূহের ব্র্যাক প্রথম এই স্মারক স্বাক্ষর করে। বেসরকারী সংস্থা সমূহের ব্র্যাক মাঠ পর্যায়ে তাদের কর্মীদের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সফল ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ব্র্যাকের এই কর্মসূচী দিনাজপুরসহ ৪২টি জেলার ২৮৩টি উপজেলায় কাজ করছে। এছাড়া সেই সাথে ৩৭টি জেলা শহরে, জেলখানা, ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ইপিজেট এবং খুলনা পোর্ট অথরিটি হাসপাতাল এবং পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের কিছু এলাকাতে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ব্র্যাককে কর্মসূচী নির্দেশনা, ঔষুধ ল্যাবরেটরি, প্রশিক্ষণ, প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন এবং ডকুমেন্ট উপকরণ ইত্যাদি সহযোগীতা দিয়ে আসছে।

যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধে এ ধরণের সচেতনতা সৃষ্টির পর্যায়গুলি সব সময় চালিয়ে যেতে হবে। গতিশীল রাখতে হবে। ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকারা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সুষ্ঠুভাবে। যক্ষ্মার মতো স্বাস্থ্য মহামারী কেবল চিকিৎসার বিষয়বস্তু নয়। জীবন যাত্রার মান, দরিদ্র, অভিবাসন এবং স্বাস্থ্য সেবা সুযোগের সাথে ব্যাপক সামাজিক ও অসাম্যকেই তা স্পষ্ট করেছে। বাংলাদেশ সরকার যে কাজটি করছে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ৮.২ কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌছে দেবার কাজ হাতে নিয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশে যক্ষ্মা রোগীর হার আমাদের বাংলাদেশের স্থান পঞ্চম তাই সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে কার্যকর নজরদারির উপর। জনগণের জীবন যাত্রার মান ফলপ্রসু। জীবন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামের লোকজন জানে না যক্ষ্মা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে ব্যাপারে তারা অজ্ঞ। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে হেও হওয়ার আশংকায় অনেকেই তা প্রকাশ করে না। যক্ষ্মা প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন রুপ নেয়নি।

জানা গেছে ৮০ লাখ লোক যক্ষ্মা জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। ২০ লাখ লোক মারা যায়। ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যক্ষ্মার জীবাণুর সংক্রমণের জন্য সহায়ক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে জানা যায়, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী শতকরা ৭০% যক্ষ্মা রোগী সনাক্ত করণ ও শতকরা ৮৫% রোগী সুস্থ্য করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ব্র্যাক। কফ সংগ্রহ থেকে শুরু করে যক্ষ্মার পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা এবং সুস্থ্যতা নিশ্চিত করাই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। আমরা আর দেখতে চাই না-২ মিনিটে একজন আক্রান্ত এবং ১০ মিনিটে মারা যায় ১ জন। তাই সকলকে এই রোগ সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হতে হবে। কিন্তু সচেতনতার অভাব কিছুদিন চিকিৎসার নেয়ার পর ফলোআপ চিকিৎসা নেয় না। তখন আবার অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। যক্ষ্মা হলো একটি জীবাণু ঘটিত রোগ যা ব্যাকটেরিয়াম টিউবার কুলোসসিরো নামে জীবাণু দিয়ে হাচি কাশির মাধ্যমে সংক্রমণ হয়। তা জনসাধারণকে বুঝাতে হবে। যক্ষ্মা দুই রকম হয়। এটা সাধারণ লোক জানে না। একটা ফুসফুসে যক্ষ্মা। আর অন্যটি বহির্ভূত যক্ষ্মা।

ব্র্যাক সুস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরী চালু হয়। ১৯৯৬ সালে এই অফিসের আওতাধীন জনসংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার ৮৬৭ জন।

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ১১টি থানায় ২৭ লাখ ৯৬ জনের কফ পরীক্ষা করা হয়। ফুসফুসের কফের রোগী ১৭ হাজার ৬শ' ৫০ জন। অন্যান্য ১৯ হাজার ৬শ' ৮২ জন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। শিশু আক্রান্ত হয় ২০৯ জন। আরোগ্য হয় ৯২,৮৪ জন। ১১ উপজেলায় ৭০ লাখ রোগী। ২০১৫ সাল পর্যন্ত টার্গেট ৫০% চিকিৎসা দিয়ে আরোগ করা। সদরে প্রতিদিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বটের হাট ব্র্যাক অফিস, রানীগঞ্জ ব্র্যাক অফিস, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, সদর হাসপাতাল ডটস্ কর্নার, দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। জেলায় মোট ল্যাবের সংখ্যা ২৩টি। মোট যক্ষ্মা নিয়ে সদর উপজেলায় কাজ করছে ১৭ জন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার। জেলায় ১৯শ' ৯৮ জন স্বাস্থ্য সেবিকা কাজ করছেন এবং ৩১ জন পৌরসভায় ডটস্ প্রোভাইডার রয়েছেন। প্রতিদিন তাদের কাছে গিয়ে রোগীরা নিয়মিত ঔষুধ সেবন করেন। মাঠ পর্যায়ে ১৯৫ জন স্বাস্থ্য কর্মী কাজ করছেন। তাই চলুন সকলে মিলে সচেতন হয়ে বাংলাদেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করতে ব্র্যাক ও সরকারকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

মো: বাপ্পী রহমান

দৈনিক নীলফামারীর বার্তা

যক্ষ্মা নিয়ে জন সচেতনতা বাড়ছে

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ব্র্যাকের কার্যক্রম ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে

নীলফামারী বার্তা প্রতিবেদক

যক্ষ্মা একটি মরণব্যাধি'- এ কথা এখন কেউ মানেন না। ভয়ও কমে গেছে । চিকিৎসকরা বলেন,যক্ষ্মা এখন মরণব্যাধি নয়। পূর্ণ কোর্সে ওষুধ খেলে এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায়। আর সাধারণ মানুষদের কাছে যক্ষ্মা সম্পর্কে জানতে চাইলে এখন তারা বলেন " যক্ষ্মা হলে রক্ষা নাই এই কথার ভিত্তি নাই"

বিশ্বের সর্বাধিক যক্ষ্মায় আক্রান্ত ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ।১৯৯৩ সালে যক্ষ্মারোগকে **'গ্লোবাল ইমার্জেন্সি'**ঘোষণা করে এবং ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে অংশিদারিত্বের ভিত্তিত্বে কাজ করার জন্য **'সমঝোতা স্বারক'**স্বাক্ষরিত হয়।বর্তমানে গ্লোবাল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় ব্র্যাকের উদ্যোগে আরও ২৮টি বেসরকারী সংস্থা জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।এ ক্ষেত্রে সুনিদিষ্ট এবং মাননিয়ন্ত্রিত কর্মকান্ডের স্বীকৃতি স্বরুপ ব্র্যাক দেশের অভ্যন্তরে যেমন প্রশংসা পেয়েছে ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক ভাবেও পেয়েছে **'স্টপ টিবি পার্টনার শিপ কোচন পুরুষ্কার'**। যক্ষ্মা বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠকে বিশ্লেষকরা জানান মাঠ পর্যায়ে যক্ষ্মাকে আরও কার্যকর ভাবে নির্মূল করতে **'সেলফ হেলপ'**কমিটি গঠনের সুপারিশের পাশাপাশি অরও জনসচেতনতা বাড়াতে হবে । অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেন , বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী বর্তমান সাফল্য ধরে রাখা গেলে ২০১৫ সালে নির্ধারিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এ সাফল্য আরও এগিয়ে নিতে গ্লোবাল ফান্ডের জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা। আশা করেন ২০১৫ সালের পরও এই তহবিল অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া যক্ষ্মা শনাক্তকরন সহজতর করতে ' **জিন এক্সপার্ট'** যন্ত্র সহজ লভ্য করার ওপর জোর দিয়েছেন।তবে তারা উল্লেখ করেন বর্তমান সরকার এ বিষয়ে একটি জরিপ চালাচ্ছে যা ২০১৫ সালে শেষ হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ যক্ষ্মা পরিস্থিতি আরো বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও তারা অতি দারিদ্র, অধিবাসী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে যক্ষ্মা চিকিৎসার আওতায় আনার উদ্যোগের কথা জানান।

নীলফামারী জেলার ইটাখোলা ইউনিয়নের গাবেরতল গ্রামের (রাশেদা বেগম)যক্ষ্মা রোগী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ করলে এ নিয়ে সচেতনতা বাড়ার প্রমাণ মিলে। এ মুহূর্তে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী ছাড়াও ব্র্যাকসহ কয়েকটি বেসরকারী এনজিও সংস্থা কাজ করছে। তারা তৃণমূল চিকিৎসা পৌছে দেয়ায় বাংলাদেশে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা কমছে। বর্তমানে ডটস পদ্ধতির আওতায় বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান ,যক্ষ্মা নিয়ে সচেতনতা বাড়ার কারণে দেশে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়েছে। ভয়ও দূর হয়েছে।

সদর উপজেলার ইটখোলা ইউনিয়নের কানিয়ালখাতা গ্রামের রুপালী বেগম , সদরের কুখাপাড়া গ্রামের সামিনা আক্তার,চড়াইখোলা ইউনিয়নের নগর দারোয়ানীর মিন্টু রহমান জানায়, যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অনেক স্থানে চিকিৎসা নিয়েছে,অনেক টাকাও খরচ করেছে,কিন্ত কোন লাভ হয়নি। পরে ব্র্যাকের যক্ষ্মা তত্বাবধানে চিকিৎসা সেবা নিয়ে তারা আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে । এখন মনে হচ্ছে ভয়ের কিছুই নেই। তাহেরা খাতুন ,তিনি ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীতে কানিয়াল খাতার চিনিরকুঠি গ্রামে কাজ করেন। বলেন, আগে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রোগী খুঁজতাম। আর এখন কারো কাশি,জ্বর ,বুকে-পিঠে ব্যাথা হলে তারাই আমাদের খুঁজে বের করেন। যক্ষ্মায় আক্রান্ত কিনা তা জানতে কফ পরীক্ষায় আসেন। এটি মানুষের সচেতনতারই লক্ষন। তিনি বলেন, প্রত্যেক দিন আমি ৮ থেকে ১০ টি বাসায় গিয়ে দেখি কেউ অসুস্থ কিনা । যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িতরা জানান , নানা কারণে দেশের গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝেই এই রোগে আক্রান্ত সংখ্যা বেশী। আর বয়সের হিসাবে ১৫ থেকে ৪৫ বছরের কর্মক্ষম মানুষের মাঝেই সংক্রমনের প্রবণতা লক্ষণীয়। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা সহজে চিকিৎসার আওতায় আসেন। সাধারণ গরিব মানুষ এতদিন চিকিৎসা থেকে দূরে থাকতেন । এর জন্য অর্থ ছাড়াও চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকাও দায়ী ছিল ।

brac

ব্র্যাক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫
বিভাগঃ রাজশাহী

প্রথম পুরস্কারঃ আরিফ রেহমান
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ নাই
তৃতীয় পুরস্কারঃ নাই

দৈনিক যায়যায়দিন

বগুড়ার শিশুরা যক্ষ্মার ঝুঁকিতে আক্রান্তের হার বাড়ছে

আরিফ রেহমান বগুড়া

বগুড়ার শিশুরা যক্ষ্মা রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। বড়দের পাশাপাশি শিশুরাও যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছে। দিন দিন শিশুদের আক্রান্তের হার বাড়ছে। আক্রান্ত শিশুরা পরিবার ও সামাজিকভাবে অনাদর-অবহেলার শিকার হচ্ছে। তাদের আলাদা চোখে দেখা হচ্ছে। শিশুরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ায় অভিভাবকদের উদ্বেগ বাড়ছে। আক্রান্তদের স্বাস্থ্য বিভাগ ও ব্র্যাক ডটস (ডাইরেক্টলি অবজারভড ট্রিটমেন্ট/সেবিকার সামনে ওষুধ সেবন) পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেয়া হলেও সরকারি হাসপাতালগুলোতে শিশুদের যক্ষ্মা চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা নেই। অভিভাবকরা শিশুদের ক্ষেত্রে প্রচলিত চিকিৎসার চেয়ে আরো উন্নত ও কম সময়ে চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবনের দাবি করেছেন।

দু'বছরে বগুড়ায় ৮৫ হাজার ৩৯৯ জনের কফ পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫ হাজার ৪৪৬ জনের যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র ২০১২ সালেই ১৭৯ জন মারা গেছে। ২০১৩ সালে বগুড়ার ১২টি উপজেলায় ৪৫ হাজার ৪২৬ জনের কফ পরীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে ২ হাজার ৭৮২ জনের যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গেছে। ওই সময়ে চিকিৎসা নিয়ে ২ হাজার ৩৭১ জন ভালো হয়েছে। আরোগ্যের হার ৮৯ শতাংশ। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৩৪৯ জন। রোগ শনাক্তের হার প্রায় ৭৩ শতাংশ। বগুড়ায় ৬৪০টি কেন্দ্রে প্রতি মাসে কফ সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২৬টি ল্যাবরেটরিতে কফ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

২০১০ সালে বগুড়ার ১২টি উপজেলায় ৪৬ শিশু যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছে। পরের বছর তা বেড়ে ৫৬ জনে দাঁড়িয়েছে। ২০১২ ও ২০১৩ সালে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বেড়ে ৭৭ জনে দাঁড়িয়েছে। শূন্য থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে। এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ২২ জন যক্ষ্মা আক্রান্ত শিশু চিকিৎসা নিয়েছে। রোগ শনাক্তের অভাবে অনেকেই চিকিৎসার বাইরে রয়েছে।

বগুড়া শহরের বাদুড়তলার দু'সন্তানের জননী কামরুন্নাহার বৃষ্টি জানান, তার ছোট মেয়ে আমেনার বয়স ১০ মাস। আট মাস বয়সে হঠাৎ মেয়ে অসুস্থ হয়ে

শুধুমাত্র ২০১২ সালেই মারা গেছে ১৭৯ জন

পড়ে। তাকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার ভুল চিকিৎসা করানো হয়। পরে অন্য ডাক্তারের পরামর্শে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করানোর পর যক্ষ্মা (গ্লান্ড টিবি) ধরা পড়ে। এরপর থেকে ব্র্যাকের ডটস পদ্ধতির চিকিৎসা তাকে দেয়া হচ্ছে। তিনি আরো জানান, এত ছোট মেয়ের যক্ষ্মা হয়, তা তাদের কারোই জানা ছিল না। শহরের জয়পুরপাড়ার ছালমা (ছদ্মনাম) জানান, তার বয়স ১১ বছর। স্থানীয় একটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। ১০ বছর বয়সে তার গলায় যক্ষ্মা ধরা পড়ে। ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর থেকে সে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা নিচ্ছে। সে আরো জানান, তার যক্ষ্মা ধরা পড়ার পর বাড়ির সবার কাছ থেকে তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। ঘর আলাদা। তার থালা, বাসন, কাপড়, সাবান আলাদা। রোগের কথা জানলে কেউই মিশবে না, এ কারণে তার রোগও গোপন রাখা রয়েছে। তাকে সবাই ভিন্ন চোখে দেখে। এটা তার খুবই খারাপ লাগে। সে আরো জানায়, প্রতিদিন এ রোগের ওষুধ খাওয়া কষ্টকর। একই এলাকার গৃহিণী মুনমুন জানান, শিশুদের রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আরো সহজ ও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। টানা এক বছর ওষুধ খাওয়া তাদের জন্য দারুণ অসুবিধার।

বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া বটতলার একমাত্র বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের নার্স গোলাপী কিবরিয়া জানান, বড়দের পাশাপাশি অনেক শিশু এখন চিকিৎসা নিতে আসছে। এ হার দিন দিন বাড়ছে। ব্র্যাক বগুড়ার ম্যানেজার আশরাফুল আলম জানান, আক্রান্ত রোগীর হাঁচি ও কাশি থেকে যক্ষ্মা ছড়াচ্ছে। ফুসফুসের যক্ষ্মা বেশি মারাত্মক। বগুড়ায় দু'হাজার ৪২৯ জন ব্র্যাকের সেবিকা যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছেন। সচেতনতার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করতে হবে।

বগুড়া বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের কনসালট্যান্ট ডা. আজিজুর রহমান জানান, শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। বড়দের সংস্পর্শে শিশুরা এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ডটস চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকৃত। এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিয়ে যক্ষ্মা রোগীরা ভালো হচ্ছে। এ রোগে ভয়ের কিছু নেই।

বগুড়ার সিভিল সার্জন ডা. মো. খলিলুর রহমান জানান, স্বাস্থ্য বিভাগ ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক বগুড়ায় যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা এবং যক্ষ্মায় মৃত্যুর হার অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ চলছে। বগুড়ায় রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ের হারও অনেক ভালো।

brac

ব্র্যাক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫
বিভাগঃ খুলনা

প্রথম পুরস্কারঃ কাজী শামীম আহমেদ
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ জুয়েল মৃধা
তৃতীয় পুরস্কারঃ মিজানুর রহমান লাকী

দৈনিক গ্রামের কাগজ

কাজী শামীম আহমেদ

যক্ষ্মা কোন রোগই না-

যক্ষ্মায় আক্রান্ত মেধাবী ছাত্রী মুন্নীর বিয়ে ভেঙ্গে যায়নি

কাজী শামীম আহমেদ, খুলনা ব্যুরো ॥ খুলনার আলীম জুট মিলের তাঁত শ্রমিক আব্দুল মান্নানের মেয়ে মুন্নী (১৮) খুলনার সরকারি বিএল কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। গত ১৭ জানুয়ারি তার বিয়ে। এরই মধ্যে ধরা পড়ে মুন্নীর 'যক্ষ্মা রোগ। বাবা মা দু'জনই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জানাজানি হলে হয়তো মেয়ের বিয়েই হবে না। এরই মধ্যে ব্র্যাকের ডটস কেন্দ্রের মাধ্যমে তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিলেন বর পক্ষের কাছে কোন কিছুই গোপন করবেন না। বিষয়টি জানানোর পর বর পক্ষ থেকে বলা হলো 'এটি কোন রোগই নয়' নির্ধারিত তারিখেই মালয়েশিয়ায় চাকরিজীবী মোমিনুর রহমানের সাথে মুন্নীর বিয়ে হয়ে গেল। মুন্নী এখন অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। সেবিকা মাজেদা বেগমের কাছে সে নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছে। মুন্নীর ভাষায়, 'যক্ষ্মা কোন রোগই না। নিয়মিত ওষুধ খেলে এ রোগ থেকে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া যায়। যার প্রমাণ আমার মা। আমিও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাব'। মুন্নীর মা রেখা বেগমেরও ২০১ সালে যক্ষ্মা হয়েছিলো। তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ।

খুলনা মহানগরীর আটরার (২-এর পৃঃ ৪-এর কলামে)

আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিটল টাটা লিঃ সোমবার যশোর পুলিশ জয়দেব ভদ্রের হাতে পিকআপ গাড়ির চাবি হস্তান্তর করে -গ্রামের কাগজ

যক্ষ্মায় আক্রান্ত মেধাবী

আলীম জুট মিলের কলোনীতে মুন্নী ও তার মা রেখা বেগমের সাথে কথা হয়। রেখা বেগম বলেন, 'কাশতি কাশতি আর যেন বাঁচি না। মনে হইত এই বুঝি মইরা গ্যালাম। কাশির সাথে জ্বর আর পুরো শরীল জুইড়ে ব্যথা। এই কষ্ট আর যেন সহ্য হয় না। স্বামী পড়ে গেল মহাদুশ্চিন্তায়। একদিন তিনি আমারে নিয়ে গেল উপজেলা হাসপাতালে। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ দিলি জ্বর আর শরীল ব্যথা সারে (সেরে) গেলিও কাশি থাইমছিল না। এই অবস্থায় একদিন ফুলতলা উপজেলার পথের বাজারের ব্র্যাকের ডটস কেন্দ্রের সেবিকা মাজেদা বেগম তার বাড়িতে গিয়ে হাজির। ছয় মাস ধরে রেখা বেগমের কাশিতে ভোগার কথা শুনে সেবিকা মাজেদা বেগম তার কফ সংগ্রহ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। কফ পরীক্ষার পর আমার কাশিতে যক্ষ্মার জীবাণু ধরা পড়ে। যক্ষ্মার কথা শুনে ভয়ে আমার সে কী অবস্থা। মনে হচ্ছিল আমি আর বাঁচুম না।' রেখা বেগম বলেন, যক্ষ্মা হয়েছে শুনে প্রথমে আমি বাঁচার আসা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ব্র্যাকের ডটস কেন্দ্রের সেবিকা মাজেদা আপা আমাকে সাহস দিয়ে বলেছিলেন, আপনি নিয়ম মেনে ওষুধ খেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। এরপর থেকে তিনি আমাকে প্রতিদিন সকালে বাড়িতে এসে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে যেতেন। ছয়মাস ওষুধ খাওয়ার পর এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার আর কাশি হয় না।

তিনি আরো বলেন, ২০১০ সালে আমার যক্ষ্মা ধরা পড়ে। ওই বছরের ১২ জুলাই আমার চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা শেষ হয় ২০১১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। এখন আমার আর কোনো সমস্যা নেই।

সেবিকা মাজেদা বেগম বলেন, ২০১০ সালে আমি ব্র্যাকের ট্রেনিং নিয়ে ব্র্যাকের ডটস কেন্দ্রের সেবিকা হিসাবে কাজ করছি। গত চার বছরে আমার তত্ত্বাবধানে ওষুধ সেবন করেছেন ১৬ জন। তারা সবাই সুস্থ হয়ে গেছে। এখন একমাত্র রোগী আছে মুন্নি। সেও ওষুধ সেবন করছে। এখন একটু কাশি হলেই এলাকার মানুষ আমার কাছে চলে আসেন। আমি তাদের কফ সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠাই। যক্ষ্মার জীবাণু ধরা পড়লে ডটস পদ্ধতিতে তাদের ওষুধ খাওয়ানো শুরু করি। ফুলতলা উপজেলার দামোদরের বরণপাড়া গ্রামের আনোয়ারা (৫৫) ছয়মাস ধরে ভুগছেন যক্ষ্মা রোগে। একদিন ব্র্যাকের ডটস কেন্দ্রের সেবিকা মুক্তি বেগম খবর পেয়ে তার বাড়িতে যান। তিনি তার কফ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে দেন। পরীক্ষার পর তার কাশিতে ধরা পড়ে যক্ষ্মার জীবাণু। গত বছরের ২৮ অক্টোবর থেকে আনোয়ারার চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা চলছে প্রায় পাঁচ মাস। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ।

একইভাবে তাজপুর গ্রামের যক্ষ্মা রোগী বাবর আলী (৬৫) ব্র্যাকের ডটস কেন্দ্রের সেবিকা নাসিমা খাতুনের কাছে গিয়ে প্রতিদিন ওষুধ খেয়ে আসেন। গত সাড়ে তিন মাস ধরে তিনি ওষুধ সেবন করছেন। এখন তার আর কাশি হয় না। বাবর আলী বলেন, এখন আমি ভালো আছি।

ব্র্যাকের খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় সূত্র জানায়, ব্র্যাক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় খুলনা জেলায় ২০০৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১ লাখ ৫১ হাজার ৪২৪ জনের কফ পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে কফে জীবাণুযুক্ত যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত হয়েছে ১২ হাজার ২২৬ জন এবং অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে রোগী চিহ্নিত হয়েছে ২ হাজার ৭৫৫ জন। সর্বমোট এ জেলায় ১৪ হাজার ৯৮১ জন রোগী চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসাকৃত রোগী আছে ১ হাজার ৭৬ জন। এ পর্যন্ত ডটসের মাধ্যমে চিকিৎসা দিয়ে ১২ হাজার ৬৬০ জন রোগীকে রোগমুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ডটস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১ হাজার ১৩জন স্বাস্থ্য সেবিকা নিয়োজিত আছে।

ব্র্যাকের খুলনা জেলা ব্যবস্থাপক মো. রফিকুল ইসলাম জানান, ব্র্যাক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় ২০০৪ সাল থেকে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে কাজ করে আসছে। বর্তমানে খুলনা জেলার নয় উপজেলায় ব্র্যাক স্বাস্থ্যসেবিকা দিয়ে চিহ্নিত যক্ষ্মা রোগীদের ডটস এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে। ডটস প্রোভাইডার হিসাবে ব্র্যাকের মোট ১ হাজার ৩১০ জন স্বাস্থ্যসেবিকা কর্মরত আছে। এছাড়াও দুর্গম এলাকায় ৩৬জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩৬টি পরীক্ষা কফ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

খুলনার সিভিল সার্জন ডা. ইয়াসীন আলী সরদার বলেন, খুলনার স্বাস্থ্য বিভাগ ও ব্র্যাক যৌথভাবে ২০০৪ সাল থেকে খুলনা জেলায় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালাচ্ছে। তিনি বলেন, খুলনা জেলায় ডটস কর্নারসহ ২৪টি ল্যাবরেটরি চালু আছে। এছাড়া এম.ডি.আর রোগী সনাক্তের জন্য সি.ডি.সি খুলনাতে একটি জীন এক্সপার্ট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩২৬ জন সন্দেহজনক রোগী পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৫ জন এম.ডি.আর রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৩ জনকে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। এম.ডি.আর রোগী চিকিৎসার জন্য একটি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল রয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে ব্র্যাকের সহায়তায় ১৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে এবং গ্রাম পর্যায়ে ২২৫টি কফ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

দৈনিক গ্রামের কাগজ

জুয়েল মৃধা

সচেতন হলে জীবন থেকে মূল্যবান সময় ঝরে না

এমডিআর যক্ষ্মাজয়ী আসমানী

জুয়েল মৃধা ॥ 'আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও, রহিমুদ্দির ছোট্ট বাড়ী রসুলপুরে যাও।'- পল্লীকবি জসীম উদ্দীন তার আসমানী কবিতায় যেকারণে আসমানীকে দেখতে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, এটি ঠিক তা নয়। তবে, এই আসমানীকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হতে পারেন। কারণ চিকিৎসকদের অদুরদর্শীতা বা বাণিজ্য চরিতার্থের কারণে এ আসমানি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ব্র্যাকের সহায়তা এবং একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর মনের অদম্য সাহসকে পুঁজি করে আজ আবারও সে মারাত্মক এক রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে লেখাপড়ার প্রতি মনোনিবেশ দিতে পারছে। এমডিআর-টিবি (Multy Drug Resistance- Tuberculosis) রোগে আক্রান্ত হয়েছিল যশোরের আসমানী। এখন সে বেশ সুস্থ।

আসমানির আকুতি যক্ষারোগীরা যেন একটু সচেতন হন। নিয়ম মেনে ওষুধ সেবন করেন। তাহলে জীবন থেকে মূল্যবান সময় গুলো ঝরে যাবে না।

আসমানী আকতার যশোর সদরের বিরামপুর গ্রামের মৃত আব্দুল হামিদের মেয়ে। বর্তমানে উপশহর সি ব্লকে একটি বাড়িতে তারা ভাড়া থাকে। এ বছর যশোর উপ-শহর ডিগ্রি কলেজ থেকে তার এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু 'রাজরোগ' যক্ষ্মার কারণে সে দু'বছর পিছিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে আছে আগামীবার নতুন করে ভর্তি হয়ে ফের লেখাপড়ায় মনোনিবেশের।

রোগবিজয়ী সাহসী এ তরুণী সব ক্লান্তি মুছে নবউদ্যোমে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। আলাপকালে সে জানালো তার এই রোগ আর সেখান থেকে পরিত্রাণের দুঃসাহসী কাহিনী।

২০১২ সালের কথা। আসমানী ঢাকায় খালাবাড়ি থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওই সময় প্রায়ই তার কাশি আর জ্বর থাকতো শরীরে। ওষুধ খেতো, কাশি কমতো, জ্বর পড়ে যেতো। কিন্তু হঠাৎ সে লক্ষ্য করে কাশির সাথে রক্ত বের হচ্ছে। পরপর তিনদিন (২-এর পৃঃ ৫-এর কলামে)

প্রত্যহ ওষুধ খাওয়ানো হতো সেখানে। এরপর অফিসিয়ালি তাকে যশোর স্থানান্তর করা হয় ব্র্যাকের মাধ্যমে। সেখানে স্থান সংকুলান না থাকায় এবং পরপর তিনবার কফ পরীক্ষায় নেগেটিভ হওয়ায় যশোরে বাড়িতে বসেই ওষুধ সেবন করছি' বলে সে। সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মী মামুন প্রতিদিন সকালে এসে তাকে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে যায়। বর্তমানে বেশ সুস্থ আসমানী। হাসিখুশি মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। এই রোগের কারণে শিক্ষাজীবনের দুটো বছর হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এমডিআর-টিবি (মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স) থেকে মুক্ত হয়ে নতুন উদ্যমে আবারও ফিরে যেতে পারবে কলেজের সবুজ চত্বরে-এ খুশিতেই কাটছে তার সময়।

কথার একপর্যায়ে আসমানীর ভাষ্য, 'আপনারা সবাইকে একটু বলবেন। সচেতন হতে বলার প্রয়োজন। তাহলে কারো এমডিআর যক্ষা হবে না। বিশেষ করে রইসকে বলবেন ও যেন নিয়ম মেনে ওষুধ খায়। তাহলে জীবন থেকে মূল্যবান সময় গুলো ঝরে যাবে না।'

শুধু আসমানী নয়, তার মতো এমন রোগীর সংখ্যা যশোরে ৮জন। তার মধ্যে তিনজন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর চিকিৎসা চলছে আসমানী, যশোর সদরের ঘুরুলিয়া এলাকার শৈলেন কুমার দাস, আড়পাড়ার রইসউদ্দিন এবং শাখারিগাতির জান্নাতুলের, শার্শা উপজেলার ছোটআঁচড়া গ্রামের মিন্টু মিয়ার।

এসব বিষয়ে কথা হয় যশোরের বিশিষ্ট চিকিৎসক বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ওহাব তরফদারের সাথে। তিনি জানান, যক্ষ্মা ৬ মাস টানা ওষুধ সেবনে রোগী সুস্থ হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু দুটো বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমত, রোগী ঠিক নিয়মে ওষুধ সেবন করছে কি না এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওষুধের গুণগতমান ঠিক আছে কি না।

তিনি বলেন, রোগীরা সাধারণত দু'মাস একনাগাড়ে ওষুধ সেবনের পর অনেকখানি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরপর থেকে তারা আর ঠিকমত ওষুধ সেবন করেন না। আবার কোন রোগী হয়তো নিয়মিত ওষুধ সেবন করছেন, কিন্তু তাদের যে ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে-তার উপাদানসমূহ সঠিকমাত্রায় নেই।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, দরপত্রের মাধ্যমে ওষুধ সরবরাহের কারণে সেই ওষুধের গুণগতমানও সঠিকভাবে যাচাই করা হয় না। এমনও হতে পারে, ওষুধটি যে তাপমাত্রায় রাখার কথা ছিল-সেটি তা করা হয়নি। মূলত এসব কারণেই এমডিআর-টিবি হয়ে থাকে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ ব্যাপারে ব্র্যাক যশোরের জেলা ব্যবস্থাপক দিপংকর রায় বলেন, যক্ষার পরবর্তী ধাপ এমডিআর-টিবি (Multy Drug Resistance- Tuberculosis)। যক্ষার ওষুধ নিয়মিত সেবন না করলে রোগী এ পর্যায়ে চলে যায়। তবে দ্রুত সঠিক চিকিৎসা দেয়া শুরু হলে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। তিনি বলেন, ২৪ মাস সঠিক নিয়মে ওষুধ খেলে এ রোগ ভালো হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, যশোরে ৮জন রোগী রয়েছে। এর মধ্যে তিনজন সুস্থ হয়ে উঠেছে। বাকীরাও সুস্থতার পথে।

দিপংকর রায় বলেন, এমডিআর-টিবি রোগী সনাক্তের সকল ব্যবস্থাই যশোরে আছে। তবে চিকিৎসার প্রথম ধাপে রোগীকে কিছুদিন খুলনায় থাকতে হয়। এরপর বাড়িতে বসেই এ চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব।

কাশিতে এভাবে রক্ত বের হয়। কালবিলম্ব না করে যশোরে ফিরে আসে; ভর্তি হয় একতা হাসপাতালে। এখানে চিকিৎসার নেবার পর ৮/৯ মাস বেশ ভালই ছিল। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে সে।

আবার ঠাণ্ডা, জ্বর, কাশি-কাশির সাথে রক্ত। এভাবে সপ্তাহখানেক চলে। তখন সে আবার ঢাকায়। লালবাগের দেশ মেডিকেলে চেকআপ করানো হয়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল, সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এরপর মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতাল। সেখানে কফ, রক্তসহ নানা পরীক্ষা। 'আমরা নিশ্চিত হই, যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছি। ওখান থেকে আমাকে পাঠানো হয়, ব্র্যাক অফিসে।' জানায় সে। তারা সবকিছু শুনে জানায়, ৬ মাস ধরে ওষুধ খেতে হবে। ঢাকায় থাকতে হবে, সেখানে থেকে ৬ মাসের ওষুধ খাওয়ার কোর্স শেষ করতে হবে।

'ওদের বলি ঢাকায় এক মাস থাকবো। পরীক্ষা শেষ হলে যশোর ফিরবো। আপাতত এক মাসের ওষুধ দেন-সেগুলো সেবন করি। পরে যশোরে রেফার করলে সেখান থেকে বাকি ৫মাসের কোর্স শেষ করতে পারবো।' কিন্তু তারা রাজি হয়নি। তারা তাকে ওষুধ দেয়নি। সে যশোরে ফিরে আসে

এরপর তার চাচা কোরবান আলী তাকে যশোরে বক্ষব্যাধি রোগ বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার তাকে দেখেশুনে দু'মাসের ওষুধ দেন। প্রতিদিন তিনটা করে সকালে খেতে হতো। আসমানী জানায়, 'আমি ওই মাস খুবই ভাল ছিলাম। ডাক্তার তাকে বলেন, সরকারি ওষুধ তেমন একটা সুবিধার নয়; বরং যাদের সামর্থ্য আছে এবং বয়সে তরুণ-তারা তাদের তিনি ওষুধ কিনে সেবনের পরামর্শ দেন।

দু'বার ওষুধ পরিবর্তন করেন ডাক্তার এবং তা ৪মাস খেতে বলেন। ডোজ কমানোর পর সে ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ দেয়া হয়। কিন্তু সুস্থ আর হয়ে উঠে না। এভাবে ৬ মাস পার হয়ে যায়। যক্ষ্মারোগীদের ৬ মাসের কোর্সে রোগ সেরে যায়। কিন্তু তার সেরকম কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

আসমানীর ভাষ্য, '৬ মাস পর আবার ওই ডাক্তারের কাছে যাই; কিন্তু তিনি তখন দেশের বাইরে। অগত্যা শহরের নোভা ক্লিনিকে ডা. প্রভাত কুমার নাথের শরণাপন্ন হই। তিনি পুণরায় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।' ডাক্তার জানান, রক্তের ইএসআর-৫৮, এক্স-রে রিপোর্টেও খারাপ অবস্থা ইঙ্গিত করছে। তিনি যক্ষ্মার ওষুধ বন্ধ করে দেন। বলেন, যেহেতু ৬মাস ওষুধ সেবন করা হয়েছে সেকারণে এখন আর ওই ওষুধ সেবনের প্রয়োজন নেই। তিনি ভিটামিন জাতীয় কয়েকটি ওষুধ দেন। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।

আসমানী জানায়, 'রোগের যন্ত্রণায় আমি কষ্টে মরে যাচ্ছি-আর ডাক্তাররা আমাকে ওষুধ না দিয়ে বারবার টেস্ট করান। এসএসসি পরীক্ষার আগের দিনও আমি মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ছিলাম। ১০৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি। এসএসসি তে এ মাইনাস রেজাল্ট হয়।'

যশোরে ফিরে এসে বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে যায় সে। সেখানে ফের পরীক্ষা করা হয়। জানা যায়, তার টিবি পজিটিভ। এরপর ঢাকায় মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে। সেখানে কফের কালচার টেস্ট করানো হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট জানানো হয়। আসমানী ভর্তি হয় মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে। 'জানতে পারি আমি এমডিআর- টিবিতে আক্রান্ত হয়েছি। মহাখালীতে ৫মাস ভর্তি ছিলাম।' প্রায় ১৩ মাস ধরে চলছে তার চিকিৎসা। এই রোগে ২৪ মাস ওষুধ খেতে হয়।

আসমানী জানায়, একটা বছর খুবই কষ্টে কেটেছে তার সময়। খুব যন্ত্রণা হতো, গাদা গাদা ওষুধ-তিন মাস ধরে লাগাতার বমি, আর গা জ্বালাপোড়া করতো সবসময়। দৃঢ় মনোবল-খাবারে প্রচুর ফল খাওয়ায় তার শরীর তেমন ভেঙে পড়েনি।

মিজানুর রহমান লাকী

ঢাকা : মঙ্গলবার ১৫ আশ্বিন ১৪২১
Dhaka : Tuesday 30 September 2014

সংবাদ

তামাক প্রবণ কুষ্টিয়ায় নিয়ন্ত্রণে যক্ষা

যক্ষাক্রান্ত ২৩৭৩ রোগীর মধ্যে সুস্থ ২৩১১

প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি গ্রামের আলম বিশ্বাস (৫৬) জানান, তার এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহের বেশি কাশি হয়। এমন সময় ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মী মমতাজ বেগম তাকে তাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। এরপর তিনি সেখানে গিয়ে কফ পরীক্ষা করান। মাইক্রোসকপি করে দেখা যায় তার যক্ষা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে নিয়মিত ঔষধ সেবনে তিনি এখন যক্ষামুক্ত বলে জানান।

এক সময় সারাদেশের ন্যায় কুষ্টিয়ায় যক্ষা একটি প্রাণঘাতি রোগ হিসেবে চিহ্নিত হলেও এখন তা আর নেই বললেই চলে। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি যেয়ে সন্দেহভাজন রোগীদের ধরে ধরে স্বাস্থ্যক্যাম্পে নিয়ে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার সম্পূর্ণ ফ্রি চিকিৎসা শেষে সুস্থ করে তুলছেন। সরকারি স্বাস্থ্য সেবার পাশপাশি বেসরকারি এই উদ্যোগ কুষ্টিয়ায় যক্ষা নির্মুলে এক বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছে বলে ভুক্তভুগীরা জানান। গ্রামের কর্মব্যস্ত মানুষেরা সময় এবং অর্থাভাবে এই রোগ পুষে থাকে। কিন্তু বর্তমানে শত শত স্বাস্থ্যকর্মী বিভিন্ন এলাকায়, গ্রামে-গঞ্জে, মানুষের দ্বারে দ্বারে সন্দেহভাজন রোগীদের শণাক্ত করছেন এবং বিনামুল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা করায় যক্ষা এখন মানুষের নিয়ন্ত্রণে।

কুষ্টিয়ার প্রেক্ষাপটে যক্ষার প্রাদুর্ভাব সারাদেশের তুলনায় বেশী হওয়ার কথা। তামাক প্রবণ এলাকা হওয়ায় এখানে সহজে ফুসফুস অক্রান্ত হয়। কুষ্টিয়ায় প্রতি বছর সরকারি হিসেব মতে প্রায় ২৮ হাজার হেক্টর, বেসরকারি হিসেবে প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়ে থাকে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক নজরদারি, নিয়মিত চিকিৎসার মাধ্যমে কুষ্টিয়ায় যক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে বলে চিকিৎসকগণ মত দিয়েছেন। নইলে তামাকপ্রবণ এলাকা হিসেবে কুষ্টিয়ায় যক্ষার প্রাদুর্ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। তবে চিকিৎসকগণ রোগীর জন্য চিকিৎসা এবং সকল মানুষের জন্য জনসচেতনতাকে প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকেন। সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, নাটিকা, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যক্ষা নিরোধ নানামুখী কর্মসূচি পালন করে থাকেন। যা যক্ষার মত জটিল এবং কঠিন রোগ থেকে মানুষকে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

কুষ্টিয়া : জগতি গ্রামের আলম বিশ্বাস নিয়মিত ওষুধ সেবনে এখন যক্ষামুক্ত -সংবাদ

কুষ্টিয়ায় যক্ষা রোগীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিলো। ২০১২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় কুষ্টিয়ায় যক্ষা রোগীর সংখ্যা ছিলো ২৩৭৩ জন। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্র্যাকের ডটস পদ্ধতিতে রুগি শনাক্ত এবং চিকিৎসা প্রদান করা হয়। কুষ্টিয়া জেলাজুড়ে ব্র্যাকের রয়েছে ৯৫৬ জন সেবিকা যারা ৩২০টি অস্থায়ী ক্যাম্পে রোগীর কফ পরীক্ষা করে থাকে। কফ পরীক্ষার জন্য রয়েছে ১৩টি ল্যাবরেটরি, যেখানে মাইক্রোসকপি করা হয়। ব্র্যাকের ডটস পদ্ধতিতে ২৩৭৩ জন রোগীর মধ্যে ২৩১১জনই এখন সুস্থ। তারা সুস্থ জীবনে ফিরে এসে সংসারের হাল ধরেছে। কুষ্টিয়ায় বর্তমানে চিকিৎসারত যক্ষা রোগীর সংখ্যা ১৫ জন। সঠিক রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসার ফলে এই জেলায় দিনে দিনে যক্ষা রোগীর সংখ্যা কমে আসছে।

যক্ষার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্র্যাক গ্রামে-গঞ্জে, উপজেলা, জেলায় বিভিন্ন ফোরামে বৈঠক করে থাকে। সেখানে বারবার তুলে ধরা হয়, এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহের বেশি কাশি ফুসফুসের যক্ষার প্রধান লক্ষণ অবহেলা না করে কফ পরীক্ষা করান, যক্ষা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির মাধ্যমে যক্ষার জীবাণু ছড়ায়, যক্ষা রোগ নির্ণয়ে কফ পরীক্ষা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি, পরিবারের কারও যক্ষার লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত পরীক্ষা করাতে হবে, কফ পরীক্ষায় যক্ষা ধরা পড়লে স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যসেবিকা, পল্লী চিকিৎসক অথবা স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতিতে নিয়মিত পূর্ণ মেয়াদে যক্ষার ওষুধ খেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হবে।

brac

ব্র্যাক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫
বিভাগঃ বরিশাল

প্রথম পুরস্কারঃ মোঃনেয়ামতউল্যাহ
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ আদিল হোসেন তপু
তৃতীয় পুরস্কারঃ আরিফ হোসেন সুমন

প্রথম আলো বাংলাদেশ

মো: নেয়ামতউল্যাহ

ভোলার শিশুরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে

নেয়ামতউল্যাহ, ভোলা | আপডেট: ০১:৪০, অক্টোবর ২৫, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

ভোলায় শিশুদের জন্য যক্ষ্মা প্রতিষেধক ওষুধ নেই। নেই সরকারি হাসপাতালে শিশুদের যক্ষ্মা শনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা। ফলে নবজাতক থেকে শুরু করে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

সদর হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ব্র্যাক ও জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতির (নাটাব) ভাষ্য, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যক্ষ্মা রোগীর আশপাশের শিশুদের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ ছাড়া শিশু জন্মের ছয় সপ্তাহের মধ্যে বিসিজি টিকা দেওয়ার কথা থাকলেও সেটি দেওয়া হচ্ছে ২৮ থেকে ৪৫ দিন পর। এ সময় শিশুর যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া শিশুকে যে বিসিজি টিকা দেওয়া হচ্ছে তাও শতভাগ কার্যকর নয়। বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য, বিসিজি ১০ থেকে ৮০ ভাগ কার্যকর।

ঝুঁকিতে থাকা শিশুকে যক্ষ্মামুক্ত রাখার দুটি পথ আছে। একটি পুনরায় বিসিজি টিকা দেওয়া ও অপরটি তাকে প্রতিষেধক চিকিৎসার আওতায় আনা। কিন্তু ভোলায় দুটি পদ্ধতির একটিও প্রয়োগ হচ্ছে না। একই সঙ্গে প্রতিষেধক চিকিৎসার ওষুধ নেই বলেও অভিযোগ আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতিষেধক চিকিৎসা হচ্ছে, শিশুর ওজন অনুপাতে টানা ছয় মাস আইসোনিয়াজাইক নামের ওষুধ খাওয়াতে হয়। শিশুর ওজন এক কেজি হলে প্রতিদিন ১০ মিলিগ্রাম করে ওষুধ ছয় মাস টানা খাওয়াতে হবে। এ প্রক্রিয়াকে আইসোনিয়াজাইক প্রিভেনশন থেরাপি (আইপিটি) বলা হয়।

এ ছাড়া শিশুর যক্ষ্মা শনাক্তকরণে আটটি পরীক্ষা পদ্ধতি আছে। যার কোনোটি ভোলার সরকারি হাসপাতালে হচ্ছে না। বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে

দেখানো ব্যয়বহুল বলে দরিদ্র রোগীদের পক্ষে এর ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য।

ভোলা সদর হাসপাতালের শিশুবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (কনসালটেন্ট) আবদুল কাদের বলেন, শিশুদের যক্ষ্মা শনাক্ত করা ও নিয়ন্ত্রণের কাজটি খুবই কঠিন। বড়দের শ্বাসনালি বা ফুসফুস থেকে নির্গত লালা, কফ, থুতু পরীক্ষা করলে এটি শনাক্ত করা সম্ভব। কিন্তু শিশুরা কফ-থুতু খেয়ে ফেলে। এ জন্য তাদের কফ-থুতু পাওয়া যায় না। নবজাতক থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের শিশুদের যক্ষ্মা শনাক্ত করতে গেলে লক্ষণ-উপসর্গ দেখে পরীক্ষাগারে পাঠাতে হয়। কিন্তু ভোলার সরকারি হাসপাতালে কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই।

সম্প্রতি কয়েকজন আক্রান্ত শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীরা উপসর্গ বুঝে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে শিশুদের পাঠাননি। এমনটি হলে শিশুরা আরও আগে সেরে উঠত বলে মনে করেন তাঁরা।

ভোলা বক্ষব্যাধি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডি এস এম জাকির হোসেন ও জেলা ব্র্যাকের ব্যবস্থাপক মোসলেম আলী শিশুদের প্রতিষেধক চিকিৎসার আওতায় না আনা, ওষুধের সংকট, ব্র্যাক ও সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের অলসতার কথা স্বীকার করে বলেন, এসব কিছু ছাড়াও শিশুর পরিবারে নেতিবাচক মানসিকতা রয়েছে। বেশির ভাগ পরিবার শিশুকে লম্বা সময়ের জন্য প্রতিষেধক চিকিৎসায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না। আইপিটির ওষুধেরও স্বল্পতা আছে।

জেলা সিভিল সার্জন ফরিদ আহমেদ বলেন, 'ওষুধ আসার পরে ব্যবহার না হলে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায়, এ জন্য আর আনানো হয় না। তা ছাড়া স্বাস্থ্যকর্মীরা শিশুর যক্ষ্মার পরীক্ষার ব্যাপারে প্রচারে অলসতা দেখাচ্ছেন। সরকারি হাসপাতালে শিশুর যক্ষ্মার পরীক্ষা যাতে ভবিষ্যতে হয় ও ওষুধ-সংকট না থাকে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব।'

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০১৫
সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার,
ঢাকা-১২১৫

দৈনিক আজকের ভোলা

আদিল হোসেন তপু

নিয়মিত চিকিৎসায় যক্ষ্মা ভালো হয়

ভোলায় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রনে কাজ করছে ব্র্যাক

আদিল হোসেন তপু॥

ভোলা সদর উপজেলার পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের বাঘার হাওলা গ্রামের মোঃ জামাল শেখের মেয়ে রোজিনা বেগম। কতই বা বয়স হবে তার। ১৪ পেরিয়ে ১৫ ছুই ছুই। স্থানীয় গাজীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ালেখা করছে। এর মধ্যেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছে সে। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত রোজিনা জানান, প্রথম দিকে আমার যক্ষ্মা রোগ ছিল না। আমি সবার সাথে খেলতাম, হাসতাম স্কুলে যেতাম। খুব ভালই কাটছিলো দিনগুলা। কিন্তু হঠাৎ আমার কাশি উঠে। এই কাশি আমার প্রায় ১ মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। কাশির সাথে প্রতি রাতে জ্বর উঠে। সেই সাথে বুক ব্যাথা, শ্বাস কষ্ট (২য় পাতায় দেখুন)

তো আছেই। রাতে কাশির জন্য আমি ঘুমাতে পযন্ত পারতাম না। আমার স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমার এই অবস্থা দেখে মা আমাকে বিভিন্ন পানি পড়া, তেলপড়া, ঝাড় ফু, কোন কিছুই বাদ রাখেনি। এই অবস্থায় আমার পরিবারের সবাই এক সময় ভেঙ্গে পরেছিলো। পরে আমার মামা অহিদ স্থানীয় সেবিকা নাজমা বেগমের সাথে আলাপ করে আমাকে স্থানীয় মাদ্রাসার হাট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে ব্র্যাকের যক্ষ্মা পরীক্ষা করার একটি ল্যাবে কাশ পরীক্ষঅ করানো হয়। তাতে কোন কিছু ধরা না পড়ায় ব্র্যাকের মাঠ সংগঠক নুরুল হাকিম আকঁন এর প্রচেষ্টায় ভোলা সদর স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয় এনে আমার রক্ত পরীক্ষা ও এক্স-রে করানো হয়। পরীক্ষা শেষে আমার যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে। এই কথা শুনে আমি ও আমার পরিবার বাঁচার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ রথীন্দ্রনাথ মজুমদার আমাদের আশ্বস্ত করে বলেন, যক্ষ্মা রোগ হলে এখন আর ভয়ের কোন কারন নেই, নিয়মিত চিকিৎসা ও ঔষুধ গ্রহণ করলে যক্ষ্মা রোগ ভালো হয়।

এর পর ব্র্যাকের ৬ মাসের কোর্সের ডটস পদ্ধতি তে শুরু হয় আমার চিকিৎসা। গত ৪/৫ মাস আমি ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকা নাজমা বেগমের বাসায় গিয়ে ঔষুধ সেবন করে যাচ্ছি। এখন আমি সুস্থের দিকে। এখন রোজিনার মোতা অনেকেই ব্রাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী পাওতায় ডটস পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিয়ে ভালো হওয়ার পথে।

পূর্ব ইরিশা ইউনিয়নের নব কুমার গ্রামের গৃহীনি রহিমা বেগম (২৫), বাঘার হাওলা গ্রামের ট্রাক ড্রাইভার মোঃ রফিখ (৪৫), অটো ড্রাইভঅর মোঃ ইউসুফ (২৫), শিবপুর ইউনিয়নের নবীপুর গ্রামের দিনমজুর মোঃ হারুন (৫০), জেলে আলাউদ্দিন (৩৫), ইউসুফ (৬৫) সহ আরও অনেকে।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার সরজমিন ঘুরে দেখা যায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত রোজিনা বেগম ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকা নাজমা বেগমের রাড়ীতে গিয়ে ঔষুধ গ্রহণ করছে।

এদিকে, পূর্ব ইরিশা ইউনিয়নের বাঘার হাওলা গ্রামের ট্রাক ড্রাইভার মোঃ রফিক জানান, জীবিকার জন্য ট্রাক চালিয়ে দেশেল বিভিন্ন জেলায় যাই। বিভিন্ন লোকের সাথে মিশি, এক সাথে থাকি গুমাই। এরই মধ্যেই আমার প্রচুর কাশি শুরু হয়ে যায়। কাশতে কাশতে এক পর্যায়ে রক্ত পর্যন্ত গেছে। এতে করে আমি ভয় পেয়ে যাই। পরে বাড়ী চলে আসি।

বাড়ীর পাশে থাকা ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সংগঠক নুরুল হাকিমের সাথে আলোচনা করলে তিনি আমার কফ পরীক্ষা করতে বলে। পরে আমি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে ব্র্যাকের কফ পরীক্ষা কেন্দ্রে কফ পরীক্ষা করাই। এতে আমার যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে। আমি কিছুটা আতংকিত হয়ে পরি। পরে নুরুল হাকিম আমাকে ভয় পাওয়ার কোন কারন নেই বলে জানায়। তিনি জানান, যক্ষ্মা রোগের ঔষুধ এখন বিনামূল্যে দিয়ে থাকি আমরা।

এখন আমি শুধু স্বাস্থ্য কর্মী সালমা বেগমের বাড়ীতে গিয়ে ঔষুধ সেবন করে আমি এখন সুস্থের দিকে। সুস্থ হয়ে আবার আগের মতো ট্রাক চালাচ্ছি।

ব্রাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর আওতায় ডটস পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিয়ে ভালো হওয়া পূর্ব ইলিশার রেহানা বেগম জানান, ২০১৩ সালের প্রথম দিকে আমার প্রচুর কাশি হয়। কাশির কারনে আমি কথা বলতে পারতাম না। খাওয়া দাওয়া সহ সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থায়। তখন মনে হতো এই বুঝি আমি মারা যাচ্ছি। এই কাশি থেকে ভালো হওয়ার জন্য আমি ভোলাসহ ঢাকার বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছি। কাশি বন্ধ হওয়ার জন্য হাই পাওয়ার ঔষুধ, তুলসি পাতার রস, আদার রস কোন কিছুই বাদ রাখিনি।

পরে আমি আমার বাড়ীর পাশে থাকা ব্রাকের স্বাস্থ্য সেবিকা কুলসুম কে বিষয়টি বলি। তখন কুলসুম আমাকে ব্রাকের পক্ষা রোগের পরীক্ষা করিয়ে আনে। এরপর যখন আমার যক্ষ্মা রোগ ধরা পরার পর থেকে স্বাস্থ্য সেবিকা কুলসুম এর বাসায় গিয়ে নিয়মিত ঔষুধ সেবনে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

তিনি জানান, এই কাশির জন্য আমি হাজার হাজার টাকা ব্যায় করেছি। অথচ আমার বাড়ীর পাশে থাকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যদি আমি পরীক্ষা করাতাম তাহলে আরও আগে ভালো হতাম। আর এত কষ্টও আমাকে পেতে হত না। রেহানা বেগমের মতো এরকম আরও অনেক যক্ষ্মা রোগীকে সুস্থ্য করছে ব্রাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর স্বাস্থ্য সেবকি ও স্বাস্থ্য সংগঠকরা। আর এর জন্য সবচেয়ে বেমি সহযোগীতা করছে সরকারের স্বাস্থ্য কেন্দ্রর সদস্যবৃন্দ।

ব্র্যাক ভোলা অফিস সূত্রে জানা যায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ভোলা থেকে যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করার জন্য ব্র্যাক ভোলা জেলা সহ সারা বাংলাদেশের ৪২টি জেলায় কাজ করছে। জেলার ৭ উপজেলায় মোট ১৫টি ল্যাব রয়েছে। যাতে নিয়মিত কফ পরীক্ষা করা হয়। জেলার ৭টি উপজেলায় বর্তমানে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত চিকিৎসাধীণ রোগীর সংখ্যা ১৩০৯জন। যক্ষ্মা রোগী সনাক্তকরণ এবং রোগীদের কফ পরীক্ষাসহ তাদের চিকিৎসার জন্য জেলায় ব্র্যাকের ১১০৭জন দক্ষ স্বাস্থ্য সেবিকা ও প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসাবে আছে ৮৪ জন নিয়মিত কাজ করে চলছেন। জেলায় ব্র্যাকের ১৫ টি ল্যাবেরেটারি এবং ভোলা সদর হাসপাতালে ১টি ডটস কর্ণার রয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর আওতায় বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়ে ১৫,৯২৯ জন কে যক্ষ্মা রোগে চিহ্নিত করেছে এর মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে ৪৮৯জন। বাকি সবাই বর্তমানে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। জেলায় ২৬৪টি কফ কালেকশন কেন্দ্র রয়েছে। এমডিআর রোগী রয়েছেন ৭জন। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীতে রোগী শনাক্ত করন এবং কফ পরীক্ষায় জনগনকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্র্যাকের এ কার্যক্রমে গ্রাম ডাক্তার, কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকের সিএইচসিপি সহ স্বাস্থ্য বিভাগের ইউনিয়ন হেলথ কর্মীরাও সহায়তা করে চলছেন। এ বিষয়ে শিবপুর কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকের সিএইচসিপি মোঃ মহিউদ্দিন জানান, ক্লিনিকে আসা রোগীদের ৩ সপ্তাহের বেশি কাশি হলেই তাদের কফ পরীক্ষার জন্য ভোলা সদর হাসপাতালে অবস্থিত ব্র্যাকের ডটস কর্নারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি চলতি বছরে আমরা এই পর্যন্ত ৫জন যক্ষ্মা রোগীকে চিকিৎসার জন্য ব্র্যাকের ডটস কর্নারে পাঠানো হয়েছে জানান।

এছাড়াও ব্র্যাক যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্র্যাক সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, মসজিদের ঈমাম, মন্দিরের পুরোহিত, গ্রাম ডাক্তার সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে নিয়ে সভা, সমাবেশ, মতবিনিময়সভা, গোল টেবিল বৈঠক ও সেমিনারের আয়োজন করে চলছে। মাঠ পর্যায়ে ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মীরা আন্তরিকভাবে কাজ করার কারনে প্রাথমিক পর্যায়ের অনেক যক্ষ্মা রোগী ধরা পড়েন। এর ফলে রোগীদের শুরু থেকেই তাদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে।

যক্ষ্মার প্রধঅন লক্ষন সমূহ ঃ

তিন সপ্তাহের বেশি কাশি, শরীরের ওজন ও ক্ষুধা কমে যাওয়া, বুকে ব্যাথা ও শ্বাস কষ্ট হওয়া, সন্ধ্যায় বা রাতে জ্বর আসা। যক্ষ্মা রোগের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ৩ সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে কফ পরীক্ষা করতে হবে। কফ পরীক্ষায় রোগ সনাক্ত হলে চিকিৎসাকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। যক্ষ্মা রোগীরা হাঁচি, কাশি দেওয়ার সময় রুমাল ব্যবহার করতে হবে।

ভোলা জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ ফরিদ আহমেদ জানান, যক্ষ্মা একটি সংক্রমন জনিত রোগ, এর কারনে প্রতি বছর বহু লোকের মৃত্যু ঘটনায়।

বর্তমানে যক্ষ্মা রোগীরা বিনামূল্য চিকিৎসা ও ঔষুধ প্রদান করা হয়। যক্ষ্মা নিরাময়ের জন্য নিয়মিত ও পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা সম্পন্ন করলে যক্ষ্মা রোগ ভালো হয়। আর এই রোগ নিয়ন্ত্রন করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের পাশাপাশি ব্র্যাকও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের এখন খেয়াল রাখতে হবে যে সব রোগী যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছে তারা নিয়মিত ৬ মাস পর্যন্ত ঔষুধ সেবন করে কিনা। যদি তারা সঠিক সময়ে কোর্স সম্পন্ন না করে তাহলে তাদের হাঁচি কাশির কারনে সুস্থ রোগীরাও যক্ষ্মা রোগের জীবানু ধারা আক্রান্ত হচ্ছে। এর জন্য আমাদরে যক্ষ্মা রোগীদের ডোস শেষ করার ব্যাপারে আরও সচেষ্ট থাকতে হবে। ব্র্যাকের ভোলা জেলা ম্যানেজার মোঃ মোসলেম আলী জানান, ভোলায় ব্র্যাক অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। এ কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হচ্ছে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী। ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য সেবিকারা যক্ষ্মা রোগী নির্ণয়ে মাঠ পর্যায়ে থেকে নিয়মিত কাজ করে চলছেন। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনার অনুযায়ী ব্র্যাক যক্ষ্মা রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছে।

তাই সকলকে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে পারলেই বাংলাদেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

দৈনিক সত্য সংবাদ

আরিফ হোসেন সুমন

আজ বিশ্ব যক্ষা দিবস

এখন নিয়মিত চিকিৎসায় সর্ম্পূন ভালো হয় যক্ষা

আরিফ সুমন ▸▸

আজ ২৪ মার্চ ২০১৪ বিশ্ব যক্ষা দিবস। দিবসটি উপলক্ষে দেশব্যাপি সরকারি ও বেসরকারী উদ্দ্যোগে বিভিন্ন সভা,সেমিনার,র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে । এবারে বিশ্ব যক্ষা দিবস ২০১৪ এর মূল বার্তা হচ্ছে,যক্ষার চিকিৎসা সেবা- বঞ্চিতদের কাছে পৌছানো। এক সময়ের এই মরনব্যাধিটি এখন নিয়মিত চিকিৎসায় সর্ম্পূন ভালো হয়। এরইধারাবাহিকতায় যক্ষার সেবা সবার তরে,পৌছে দিবো ঘরে ঘরে স্লোগান কে সামনে রেখে দিনটিতে নানা কর্মসূচী পালন করা হচ্ছে। বিশ্বে যক্ষার বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি (২০১২)ঃ বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৮৬ লক্ষ মানুষ যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যক্ষায় প্রতি বছর প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ যক্ষা রোগে ভুগছে। ২২ টি দেশে বিশ্বের মোট যক্ষা রোগীর ৮০% বাস করে। মোট যক্ষারোগীর ৪০% দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশে যক্ষা রোগের সার্বিক প্রেক্ষাপট (২০১২) ঃ বাংলাদেশে যক্ষা একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। প্রতি বছর প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় নতুন রোগীর হার বাড়ছে ২২৫ জন। এ ছারা প্রতি বছর ১ লক্ষ জনসংখ্যায় নতুন/পুরাতন রোগীর হার ৪৩৪ জন। প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় প্রতি বছর মৃত্যুর হার ৪৫ জন। তবে (২০১৩) সালে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৮৪,৪৯২ জন রোগী সনাক্তকরন করা হয়েছে। সনাক্তকরনের হার প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় ১১৯ জন।

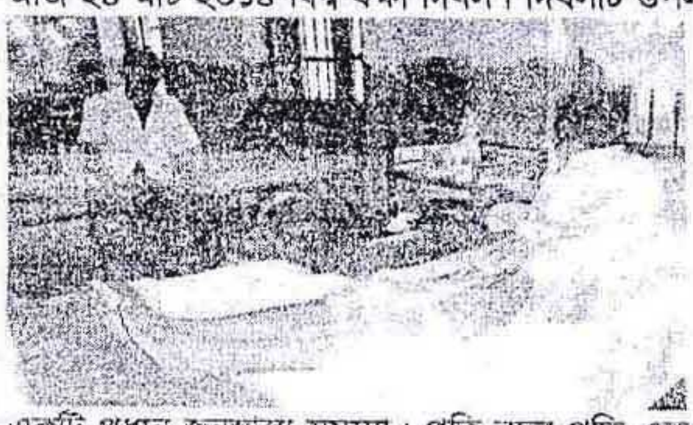

৩য় পাতায় দেখুন

এ ব্যাপারে বিস্তারীত জানতে চাহলে বরিশালের সিভিল সার্জন ডা ঃ এটি এম মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের দেশটা যদি ধ্বংশ হয় তবে তা যক্ষার কারনেই হবে। কারন অসচেতনতার জন্য এই রোগটি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছিনা। তবে যক্ষা রোধে সরকার বেশ আন্তরিক। যক্ষা রোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মূল উদ্দেশ্য সমূহ ঃ (০১) নব্বই দশক থেকে যক্ষার কার্যক্রম বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারন হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা ও অর্জিত হয়েছে। (০২) যক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলে ও সেবা-বঞ্চিত প্রায় অর্ধেক যক্ষা রোগীকে এখন ও চিকিৎসার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।(০৩) যক্ষা রোধে যক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।(০৪) সরকারি ও বেসরকারি সকল উদ্দ্যোগকে সম্প্রসারীত করেলকল যক্ষা রোগী চিহ্নিতকরন চিকিৎসা সেবা প্রদান ও আরোগ্য নিশ্চিত করে যক্ষায় শূন্যর্মৃত্যু,সংক্রামক এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর করে হাজার জীবন রক্ষা করা যাবে।যক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপায় সমূহ ঃ (০১) জেনে রাখা ভালো। যক্ষার লক্ষনযুক্ত রোগী,বিশেষত জীবানুমুক্ত ফুসফুসের যক্ষা,ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষা,শিশুদের যক্ষা ও ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষায় আক্রান্তদের দ্রুত চিহ্নিতকরন।(০২) যক্ষায় আক্রান্ত রোগী যারা রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ হয়নি তাদেরকে শনাক্তকরন।(০৩)দরিদ্র ও ঝুকিপূর্ন জনগোষ্ঠি যেমন-মহিলা, শিশু, অভিবাসী, কয়েদী, অনিয়ন্ত্রিত ঔষধ ব্যবহারকারী,যৌন্যকর্মী ও দূর্গম এলাকার অধিবাসীদের কাছে সেবা পৌছানো।(০৪)শিশু যক্ষা রোগী,ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষা ও টিবি এইচআইভির বিরুদ্ধে বিশেষ প্রচারাভিযান।(০৫) নতুন অত্যাধুনিক মেশিন (জেন-এক্সপার্ট) এর মাধ্যমে যক্ষার কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা।(০৬) রাজনৈতীক সদিচ্ছা এবং নিরবছিন্ন অর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা।(০৭) সম্পদ আহরন ও সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার। বরিশালে যক্ষা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কমেছে জটিল ভাবে আক্রান্ত যক্ষায় আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। আজ সোমাবার বিশ্ব যক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল এক সংবাদ সন্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ, ব্র্যাক ও বরিশাল প্রেসক্লাবের যৌর্থ আয়োজনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সন্মেলনে তথ্য সূত্রে জানাগেছে, ২০১৩ সালে বরিশালে ২ হাজার ৯শ ৭৯ জন যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। ওই বছর জটিল ভাবে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন ১৬ জন আর মৃত্যু বরণ করেন ১৩ জন যক্ষা রোগী। এর আগের বছর ২০১২ সালে মারা যান ২২ জন যক্ষা রোগী। ওই বছর এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন ২ হাজার ৭শ' ৮ জন। পাশাপাশি ওই বছর জটিল ভাবে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন মাত্র ৩ জন মানুষ। এদিকে আজ বিশ্ব যক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ, ব্র্যাক ও বরিশাল প্রেসক্লাবের যৌর্থ আয়োজনে নানান কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। "যক্ষার সেবা সবার তরে, পৌছে দেব ঘরে ঘরে" এই শ্লোগান নিয়ে আজ সকাল সাড়ে ৮ টায় নগরীতে একটি র‍্যালী বেড় করা হবে। র‍্যালীটি নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হল থেকে শুরু করে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবে এসে শেষ হবে। সকাল ৯ টায় প্রেসক্লাব মিলেনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় সকল সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন আয়োজকরা। অপরদিকে গতকাল অনুষ্ঠিত সংবাদ সন্মেলনের সভাপতিত্ব করেন জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ এটিএম মিজানুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন, ডিপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ বাসুদেব কুমার দাস, বরিশাল টিভি হাসপাতালের সিনিয়র কনস্যাটেন্ট ডাঃ মোঃ মোকলেছুর রহমান, বরিশাল সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ মিজানুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডাঃ মাহমুদ হাসান, ব্র্যাক'র রিজনাল ম্যানেজার সংকর মহাজন, বরিশাল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পুলক চ্যাটার্জি, বরিশাল হেলথ্ জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জে. খান স্বপন

brac

ব্র্যাক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫
বিভাগ: ঢাকা

প্রথম পুরস্কার: সৈয়দ মোকছেদুল আলম
দ্বিতীয় পুরস্কার: ফারহানা মির্জা
তৃতীয় পুরস্কার: মীরনাসির উদ্দিন উজ্জ্বল

সাপ্তাহিক বাংলাভুমি

সৈয়দ মোকছেদুল আলম

যক্ষ্মা নিরাময় হয়

বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়া যায়

॥ সৈয়দ মোকছেদুল আলম ॥

বাংলাদেশে যক্ষা একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ২০১৩ সালে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১লাখ ৯০হাজার ৬৩৫জন যক্ষা রোগী সনাক্ত হয়েছে এবং যক্ষা জীবাণু যুক্ত রোগী সনাক্ত হয়েছে ১লাখ ৫ হাজার ৩৯৭ জন। ২০১২ সালে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সনাক্তকরণ রোগীর ৯৩% আরোগ্য লাভ করেছে।

যক্ষা নিয়মিত চিকিৎসায় নিরাময় হয়। যক্ষা একটি জীবানু ঘটিত রোগ। যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম . টিউবারকুলোসিস নামক জীবাণু দ্বারা হয়ে থাকে। যক্ষা দুই প্রকার । ১) ফুসফুসের যক্ষা ও ২) ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষা। ফুসফুসের যক্ষা: ক. কফে জীবাণুযুক্ত ফুসফুসের যক্ষা, খ. কফে জীবাণুমুক্ত ফুসফুসের যক্ষা।

বিশ্বে প্রতি বছর ৮.৭ মিলিয়নের বেশি লোক প্রতি বছর যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়। ১.৪ মিলিয়ন লোক প্রতিবছর যক্ষায় মারা যায়। ২২টি দেশে বিশ্বের মোট ৮০% যক্ষা রোগী বাস করে। মোট যক্ষা রোগীর ৪০% দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে বাস করে।

জয়দেবপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ব্র্যাকের ডটস্ কেন্দ্রে যক্ষা রোগীকে স্বাস্থ্য সেবিকা ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। ছবিঃ বাংলাভূমি

মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি (ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষা)

MDR এমন একটি অবস্থা যেখানে যক্ষা রোগের চিকিৎসার প্রধান দুটি ঔষধই (রিফামপিসিন ও আইসোনিয়াজাইড) জীবাণুর বিরুদ্ধে আর কাজ করে না। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট মানুষের অনিয়মিত চিকিৎসার ফল। সময়মত চিকিৎসা গ্রহন না করলে, চিকিৎসার ক্যাটাগরী ভুল করলে বা নিজে চিকিৎসার ব্যবস্থা বন্ধ করলে মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। MDR সহজে নিরাময় হয় না। প্রচলিত ঔষধ ব্যবহার করে লাভ হয় না এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ মেয়াদী। MDR রোগীর চিকিৎসার সময়কাল ২০ মাস। এর মধ্যে ৮ মাস রোগীকে হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা নিতে হয়। পরবর্তী ১২ মাস নিজ এলাকায়

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

৮ম পৃষ্ঠার পর-- যক্ষ্মা নিরাময় হয়

দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য সেবীকা/স্বাস্থ্য কর্মীর উপস্থিতিতে নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হয়। সাধারণ যক্ষ্মায় চিকিৎসার মেয়াদ মাত্র ৬মাস।

উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা সদর হাসপাতাল, ৪৪টি বিভাগীয় বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, ৮টি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল এবং ৪টি বিভাগীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, আরবান ক্লিনিক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সামরিক হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতাল, ইপিজেড, বিজিএমইএ, অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জেলখানায় বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের জন্য কফ পরীক্ষা করা হয় এবং চিকিৎসা পাওয়া যায়।

বড়দের মত শিশুদের যক্ষ্মা রোগ হতে পারে। তবে শিশুর যক্ষ্মারোগ সনাক্তকরণের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন। যদি কোন শিশু কফে জীবাণু যক্ষারোগীর সংস্পর্শে আসে এবং তার যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা মাত্র চিকিৎকের মাধ্যমে তার যক্ষ্মা প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিশুর যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ

এক নাগারে তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি। ৩মাস ধরে ওজন না বাড়া বা ওজন কমে যাওয়া। ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়া। গলায় গুটির মত ফুলে যাওয়া। পিঠে ব্যাথা বা ফুলে যাওয়া। মেরুদন্ড বাঁকা হয়ে যাওয়া। পেটে পানি আসা বা ফুলে যাওয়া।

যক্ষ্মার চিকিৎসা পদ্ধতি

যক্ষ্মার চিকিৎসা DOTS পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিদিন ঔষধ গ্রহণ নিশ্চিত হয়। এই পদ্ধতিতে রোগ নিরাময়ের হার প্রায় ১০০% ভাগ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকা সহজেই DOTS পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে।

গাজীপুর জেলায় বর্তমান জনসংখ্যা ৩০ লাখ ২৪ হাজার ৩৮৩ জন। মোট উপজেলা ৫টি। কফ সংগ্রহ কেন্দ্র ৩১২টি। ল্যাবরেটরি আছে ১১টি। স্বাস্থ্য সহকারী ২৬০ জন, স্বাস্থ্যকর্মী (ব্র্যাক) ১৫৩, স্বাস্থ্য সেবিকা ১ হাজার ৭১৮ জন, চিকিৎসাধীন রোগী ২হাজার ৯১৯ জন (নভেম্বর ২০১৪)।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ঃ যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা মৃত্যু ও সংক্রমণের হার কমিয়ে আনা। যাতে যক্ষ্মা আর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে না থাকে।

উদ্দেশ্যঃ কফে যক্ষ্মা জীবানুযুক্ত রোগীর কমপক্ষে৭০% সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকৃত রোগীদের মধ্যে কমপক্ষে ৬৫% রোগী আরোগ্য করা করা যায়। ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা এবং যক্ষ্মার কারণে মৃত্যু অর্ধেক কমিয়ে আনা।

সরেজমিন গাজীপুর

৬ ডিসেম্বর ২০১৪। সকাল ৮টা। গাজীপুরের জয়দেবপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় DOTS কেন্দ্রে ৯ জন যক্ষ্মা রোগীকে ঔষধ খাওয়ানো হয়। এই কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সেবিকা খোরশেদা প্রায় ১০ বছর এ দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সহযোগিতা সংস্থা ব্র্যাক এর স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে কাজ করছেন। পাঁচ মাস আগে তিনি হাকিমকে (১৫) ব্র্যাকের ভোড়া, হাজীবাগ শাখায় নিয়ে যান। রানী বিলামমনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র হাকিম। জ্বর, কাশি, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি রোগের লক্ষণ ছিল। কফ পরীক্ষা করে যক্ষ্মা ধরা পড়ে। চলতি বছরের ১৮ জুলাই হাকিম এখানে এসে খোরশেদার সামনে সরাসরি উপস্থিত থেকে ঔষধ সেবন করে। এখন তার রোগের লক্ষণগুলো নেই। ঔষধ সেবনে কোন রকম অসুবিধা বোধও করছে না। এছাড়া শিরিন (১৮), জসীম (৫৫), মনোয়ারা (২৬), ফাতেমা (৪০), শুক্কুর আলী (২৫), আবু তাহের (৩০) -কে সরাসরি ঔষধ সেবন করানো হয়। এর মধ্যে আবু তাহেরের ডান চোখে যক্ষ্মা ধরা পড়ে। এদের মধ্যে চারজনের বাড়ি গাজীপুরের বাহিরে অন্যান্য জেলায়। পেশাগত কারণে এরা গাজীপুরে সাহাপাড়া ও বিলাশপুরে বাস করে।

এদিন DOTS কেন্দ্রে ব্র্যাক গাজীপুর জেলার সিনিয়র জেলা ম্যানেজার (এইচএলপিপি) হিমাংশু মোহন মন্ডল, সিনিয়র উপজেলা ম্যানেজার মোঃ ইসমাইল হোসেন ও প্রোগ্রাম অর্গানাইজার জরিনা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে কর্মরত সরকারি এবং বেসরকারি ল্যাবকর্মীরা আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে ল্যাবরেটরিতে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি ৬টি ও ব্র্যাক পরিচালিত ৫টি ল্যাবরেটরিতে গাজীপুরে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় করা হচ্ছে। গাজীপুর সদর হাসপাতালে স্থাপিত জিন এক্সপার্ট (Gene Expert) সেন্টার থেকে MDR যক্ষ্মা রোগী সনাক্ত করা হচ্ছে।

গাজীপুরে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করতে কেন্দ্রীয় কারাগার কাশিমপুরে আরো একটি DOT কর্ণার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হচ্ছে। এর কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১৫ থেকে শুরু হবে।

গাজীপুর সিভিল সার্জন এর নেতৃত্বে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে EPI কর্মসূচির ন্যায় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

দৈনিক মুন্সিগঞ্জের কাগজ

ফারহানা মির্জা

যক্ষ্মা থেকে মুক্ত পাওয়া মাবিয়া খাতুনের গল্প

ফারহানা মির্জা

রাবিয়া খাতুন। বয়স ৭০। স্বামী বাচ্চু মিয়া মারা গেছেন অনেক আগেই। একমাত্র ছেলে মো. হানিফের সংসারেই থাকেন তিনি । হানিফ সুতার মিলে কাজ করেন। হানিফের ঘরে দুই সন্তান ও স্ত্রী রয়েছে। সুতার মিলে কাজ করে যা অর্থ উপার্জন করেন তা দিয়েই কোন রকমে সংসার চলে। টানাটানির সংসারে বৃদ্ধা মাবিয়া অনেক দিন থেকেই কাশিতে ভুগছিল। সদর হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনে খেয়েছেন তিনি। কিন্তু ২ মাস হয়ে গেলেও সারেনি কাশি। সেই সাথে বুকে ব্যাথা ও জ্বর। পরে পার্শ্ববর্তী ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকা রাহেলার কাছে যান। রাহেলা ছোট দু'টি পত্র দিয়ে সেখানে কফের নমুনা রাখার জন্য বলেন। সেই কফ পরীক্ষা করে দেখা যায় মাবিয়া যক্ষা আক্রান্ত। পরে ব্র্যাক ডটস'র আওতায় মাবিয়ার চিকিৎসা দেয়া হয়। ওজন মেপে তার জন্য ওষুদ নির্ধারণ করা হয়। ছয় মাস প্রতিদিন সকালে খালি পেটে সেবিকা রাহেলার বাড়ি গিয়ে ওষুধ খেয়ে আসতেন মাবিয়া। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। যক্ষা ধরা পড়লে এক নাগারে ছয় মাস ওষুধ খেলে যক্ষা ভালো হয়ে যায়। তবে ফুসফসের বাইরে যক্ষা হলে নয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত ওষুদ খেতে হয়।

এখনও বাংলাদেশে লাখে ২২৫ জন যক্ষা রোগী রয়েছে। এদের অনেকেই এখনও অসচেতন। ভীতি আর অজ্ঞতায় তারা চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। একটু সচেতনতাই দিতে পারে যক্ষা থেকে মুক্তি। এছাড়া অনেকেই দীর্ঘ সময় ওষুধ সেবনের বিড়ম্বনার কারণে ধারাবাহিকতা রাখতে পারে না। পরে পুনরায় তারা আবারও যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সঠিক সময়ে রোগ চিহ্নিত করে চিকিৎসা নেয়া যায় তাহলে যক্ষা একেবারেই সেরে যায়।

বর্তমানে ডটস পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদী, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হয়। নিয়মিত, সঠিক মাত্রায় এবং পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসায় যক্ষা সম্পূর্ণ ভালো হয়। তবে অনিয়মত এবং অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় এই রোগ ভালো হওয়ার পরিবর্তে আরও জটিল আকার ধারণ করে। দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, জেলা সদর হাসপাতালে, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনজিও ক্লিনিক ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়সহ বিনামূল্যে যক্ষার চিকিৎসা করা হয় এবং ওষুধ দেয়া হয়।

এখনও বাংলাদেশে লাখে ২২৫ জন যক্ষা রোগী রয়েছে। এদের অনেকেই এখনও অসচেতন। ভীতি আর অজ্ঞতায় তারা চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। একটু সচেতনতাই দিতে পারে যক্ষা থেকে মুক্তি। এছাড়া অনেকেই দীর্ঘ সময় ওষুধ সেবনের বিড়ম্বনার কারণে ধারাবাহিকতা রাখতে পারে না। পরে পুনরায় তারা আবারও যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সঠিক সময়ে রোগ চিহ্নিত করে চিকিৎসা নেয়া যায় তাহলে যক্ষা একেবারেই সেরে যায়। বর্তমানে ডটস পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদী, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হয়। নিয়মিত, সঠিক মাত্রায় এবং পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসায় যক্ষা সম্পূর্ণ ভালো হয়। তবে অনিয়মত এবং অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় এই রোগ ভালো হওয়ার পরিবর্তে আরও জটিল আকার ধারণ করে।

২০০৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জেলায় ব্র্যাক ১২ হাজার ১শ' ৯৩ জন যক্ষার জীবানু বহনকারীকে সনাক্ত করে এবং ডটস-এর আওতায় চিকিৎসা দেয়। এর মধ্যে গড়ে প্রায় ৯৬ শতাংশ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছে। বাকী ৪শতাংশ মৃত্যু ও অস্পূর্ণ চিকিৎসার জন্য সুস্থ হতে পারেনি।

ব্র্যাকের সদর উপজেলার সিনিয়র ম্যানেজার মো মিজানুর রহমান জানান, সাধারণত ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের এই রোগে আক্রান্ত বেশী হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে মিল শ্রমিকের সংখ্যই বেশী। জেলায় ব্র্যাক ৫টি ধাপে যক্ষা নিরাময়ে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য কর্মী, স্বাস্থ্য সেবিকা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, মাঠ সংগঠক, উপজেলা ম্যানেজার এবং জেলা ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে রোগ চিহ্নিত, ঔষধ প্রদান ও সেবন, সচেতনতা, আরোগ্য, ও মোটিভেশন চলে। আক্রান্ত রোগীদের ওষুধ সেবন শুরুর প্রথম দু'মাস পর, এরপর পাঁচ মাস পর এবং সবশেষে ছয় মাস পর মোট তিন বার কফ পরীক্ষা করা হয়। নিয়মিত ফলোআপের রাখা হয় রোগীদের। কিভাবে পরিবার ও সমাজের অপর ব্যক্তিকে যক্ষার জীবানু থেকে রক্ষা করা যায় সেই শিক্ষাও দেয়া হয় আক্রান্তদের। জেলা ও উপজেলা ম্যানেজার সপ্তাহে একবার খানা ভিজিট করেন। জেলায় ব্র্যাকের মোট ১ হাজার ৫৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী যক্ষা নিমুর্লে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া যক্ষা নির্মূলে ব্র্যাকের উদ্দ্যোগে গ্রাম্য ডাক্তার, মসজিদের ইমাম, শিক্ষ, সুশীল সমাজ, ভালো হওয়া রোগী, মিল শ্রমিক, নারী সংগঠনের সদস্য, মেডিকেল অফিসার, বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে গোলটেবিলের মাধ্যমে নিয়মিত সভা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গণ নাটক, ওরিয়েন্টেশন, ক্যাবল টিভি ম্যাসেজের মাধ্যমে এই সেবার খবর জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দেওয়া হয়।

জেলায় ৯৪০ জন স্বাস্থ্য সেবিকা রয়েছে। প্রতি সেবিকার তত্ত্ববধানে ২২০ টি খানা রয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে এক একটি খানা ধরা হয়। সেবকা প্রতিদিন তার তত্ত্ববধানের পাঁচটি খানা ভিজিট করেন এবং কারো তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে কাশি আছে কিনা তার খোঁজ করেন। তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে কাশি থাকলে কফ পট বিতরণ করেন এবং কফ পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করেন। যক্ষার জীবানুর উপস্থিতি থাকলে মেডিকেল অফিসারের চিকিৎসাপত্রে স্বাস্থ্য সেবিকা রোগীকে ছয় মাস ধরে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ান। রোগী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলে এ কাজের জন্য স্বাস্থ্য সেবিকা রোগী প্রতি ৫শ' টাকা সম্মানী পান। পাশাপাশি জ্বর, ঠান্ডা, কৃমি, গ্যাস্টিক, নিউমোনিয়া, রক্ত স্বল্পতা, মুখে ঘা, দাউদ ও গলগন্ডসহ ১০ রোগের ওষুধ বিক্রি করেন তিনি। এছাড়া ৮৬ জন রয়েছে স্বাস্থ্য কর্মী নিয়মিত বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে রোগী চিহ্নিত, স্বাস্থ্য ফোরামের মাধ্যমে তথ্য প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর ব্র্যাক এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে।

স্বাস্থ্য সেবিকা রাহেলা জানান, নয় মাস আগে তিনি এ কাজে যোগ দিয়েছেন। পরিবারের অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি সেবামূলক এ কাজটি করতে পেরে আনন্দিত তিনি। তার তত্ত্বাবধানে পাঁচ জন রোগী রয়েছে। এর মধ্যে দু'জন পুরো সুস্থ এখন। বাকীরা এখনও চিকিৎসার মধ্যে আছেন। ছয় মাস ওষুধ সেবনের পর এরা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে তিনি আশাবাদী । রোগীরা সকালে তার বাড়িতে আসেন ওষুধ খাবার জন্য । কেউ যদি আসতে না পারেন তাহলে রাহেলা নিজে গিয়েও রোগিকে ওষুধ খাইয়ে আসেন। তবে এখনও এ বিষয়ে রোগীদের যথেষ্ট অনুৎসাহ রয়েছে। কেউ কেউ প্রতিদিন ওষুধ খেতে আসা বিরক্ত মনে করেন। একেবারে ওষুধ নিয়ে যেতে চান। আবার নিয়ে গেলেও নিয়মিত ওষুধ সেবন করেন না।

ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি তানভীরুল ইসলাম জানান, ভূগৌলিক কারণে মুন্সীগঞ্জ জেলায় অনেক চর রয়েছে। এসব অনঅগ্রসর এলাকায়ও ব্র্যাক চিকিৎসা সেবা পৌছে গেছে। যক্ষা নির্মূলে ব্র্যাক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই যক্ষারোগী সনাক্ত হচ্ছে এবং বহু রোগী সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। মুন্সীগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. কাজী শরিফুল আলম জানান, যক্ষা সনাক্ত করণ এবং ডটস কর্মসূচীসহ যক্ষা নিয়ন্ত্রণে ব্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

মীর নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল

মুন্সীগঞ্জে ১২ হাজার যক্ষ্মারোগী শনাক্ত, চরাঞ্চলে বেশি

মীর নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল, মুন্সীগঞ্জ ॥ মুন্সীগঞ্জে ১২ হাজার ১৫৩ যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে ৯ হাজার ২৯৪। সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ওষুধ সেবনের (ডটস) মাধ্যমে চিকিৎসাধীন রয়েছে ২ হাজার ৭৮ রোগী। যক্ষ্মায় মারা গেছেন ৬৮১ জন। আরোগ্য লাভের হার ৯৩ শতাংশ। এদের মধ্যে ১০ জনের এমডিআর (ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা) শনাক্ত হয়েছে। ভয়াবহ এই যক্ষ্মা থেকে মুক্ত হয়েছে ৬। মারা গেছেন একজন, বাকি ৩ জনের ব্যয়বহুল চিকিৎসা চলছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের চলতি মাস পর্যন্ত প্রায় আট বছরের চিত্র এটি। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় চরাঞ্চলের যক্ষ্মা রোগীর প্রকোপ বেশি। এছাড়া মিল-কলকারখানার শ্রমিকরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছে। ভৌগোলিক কারণে নদীবেষ্টিত এই জেলায় চরাঞ্চলের বহু মানুষের বসবাস। তাই ৬ চরাঞ্চলের ঘরে ঘরে রোগী শনাক্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যক্ষ্মারোগ নিরাময়ে এই জেলায় এখন নীরব বিপ্লব ঘটেছে। কেটে গেছে যক্ষ্মা আতঙ্ক। 'যক্ষ্মা হলে রক্ষা নেই' এই প্রবাদ এখন ঠাঁই নিয়েছে জাদুঘরে। এখন প্রবাদ চলছে 'বিনামূল্যে যক্ষ্মা চিকিৎসা ঘরে ঘরে, সুস্থ হচ্ছে জনে জনে'। জেলা সিভিল সার্জন ডা. কাজী শরিফুল আলম জানান, যক্ষ্মার চিকিৎসা এখন অতি সহজলভ্য। কিন্তু কোন যক্ষ্মা রোগী ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন না করলে মহাবিপদ। যক্ষ্মা একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা প্রাথমিকভাবে ফুসফুস আক্রান্ত করে। তাই রোগী শনাক্তের মাধ্যমে ব্র্যাকের কর্মীরা ডটসের আওতায় ঘরে ঘরে গিয়ে ওষুধ সেবন করানোর ফলেই এই সাফল্য আসছে।

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচীর সিনিয়র জেলা ব্যবস্থাপক সুব্রত কুমার বিশ্বাস জানান, যক্ষ্মা রোগীর জন্য ১ হাজার ৫৯ সেবিকা কাজ করছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওষুধ খাওয়া বন্ধ করার পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। আর তাই সেবিকাদের সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিদিন রোগীরা ওষুধ সেবন

মারাত্মক ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগী ১০ জন

করছে। এসব কাজের তদারকি করা হচ্ছে পাঁচ স্তরে। এতে এমডিআর হওয়ার আশঙ্কা থাকছে না। মুন্সীগঞ্জ বক্ষব্যাধি হাসপাতালে জুনিয়র কনসালট্যান্ট বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডা. এএসএম ফখরুল আহসান জানান, এখনও বাংলাদেশে লাখে ২২৫ যক্ষ্মা রোগী রয়েছে। এদের অনেকেই এখনও অসচেতন। ভীতি আর অজ্ঞতায় তারা চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। একটু সচেতনতাই দিতে পারে যক্ষ্মা থেকে মুক্তি। যদি সঠিক সময়ে রোগ চিহ্নিত করে চিকিৎসা নেয়া যায় তাহলে যক্ষ্মা একেবারেই সেরে যায়। আর এ কারণেই যক্ষ্মা চিহ্নিতকরণে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা

(১৯ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

মুন্সীগঞ্জে ১২

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। সরেজমিন ঘুরে এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চরাঞ্চল ও অনগ্রসর এলাকাগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যক্ষ্মায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এদের আবার অনেকেই ধূমপায়ী। লৌহজং উপজেলার পদ্মারচরের পাইকারার চর গ্রামের রহমান ঘরামি (৪৬) ও জহিরউদ্দিন (৫০) যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে নিয়মিত ছয় মাস ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়েছেন। তারা দু'জনেই ধূমপায়ী ছিলেন। যক্ষ্মা রোগের জীবাণু পাওয়া গেছে পার্শ্ববর্তী বেজগাঁওচরের শাহিনুর আক্তার (১৮), ঝাউটিয়া চরের ফজল তালুকদার (৪৫), গোয়ালীরচরের জহিরুল ইসলাম (৫০), আব্দুস সালাম (৫৫), মোতালেব মিয়া (৪৫), সংগ্রামবীর চরের আ. হামিদ (৬০), দানেশ ফকির (৬০) ও শাইনহাটিরচরের মোজাফ্ফর মাদবরসহ (৫০) আরও অনেকের। তাদের ওষুধ খাওয়াচ্ছেন সরাসরি ব্র্যাকের সেবিকা। যারা সুস্থ হয়েছেন তাদের অনুভূতিও অন্যরকম। সদর উপজেলার মিরেশ্বের বাস্তুহারা গ্রামের বিধবা মারিয়া খাতুন (৭০) বলেন, 'আমি অহন কত শান্তিতে আছি, তা বুঝাইতে পারুম না। যক্ষ্মা থেইক্যা যে এমুনভাবে মুক্তি পামু, আগে বুঝতে পারিনি। ছয় মাস ওষুধ খাওনের লেইগা কোথাও বেড়াইতে পর্যন্ত যাই নাই, আইজ এর ফল পাইতাছি।' গত ৬ আগস্ট ওষুধের কোর্স শেষ করে কফ পরীক্ষায় ভাল রিপোর্ট এসেছে। তাকে ওষুধ খাইয়েছেন ব্র্যাকের সেবিকা রাহেলা আক্তার সঞ্চিতা। কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করায় রাহেলা ব্র্যাক থেকে ৫শ' টাকা পেয়েছেন। রাহেলার তত্ত্বাবধানে এখনও ৫ রোগী ওষুধ খাচ্ছেন। অর্ধ শিক্ষিত গৃহবধূ রাহেলা ব্র্যাকের সেবিকা ট্রেনিং নিয়ে এখন যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা এবং চিহ্নিতকরণ কাজ ছাড়াও সমাজের অনেক সেবামূলক কাজ করছেন। এই সেবিকা বলেন, 'এখন জীবনটা বেশ উপভোগ করতাছি। মানুষের উপকার কইরা ভাল লাগা পাইতাছি। কয় টাকা পাইলাম হেইডা বড় কথা না, অসহায় এক মায়েরে শান্তি দিতে পারছি, রোগ মুক্তির জন্য সহযোগিতা করতে পারছি, এর লেইগাই শান্তি।'

বিশেষজ্ঞরা জানান, বাতাসের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ছড়ায়। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে রোগের জীবাণু বাতাসে গিয়ে মিশে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে তিন সপ্তাহ বা এর অধিক সময় ধরে কাশি হয়, কাশির সঙ্গে রক্ত যাওয়া বুকে ব্যথা অথবা শ্বাস নেয়ার সময় ও কাশির সময় ব্যথা হয়। অস্বাভাবিকভাবে ওজন হ্রাস, অবসাদ অনুভব করা, জ্বর, রাতে ঘাম হওয়া, কাঁপুনি ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। তবে যক্ষ্মা হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রোগীকে পরিবার-পরিজন থেকে আলাদা করার দরকার নেই। স্পেশাল কোন খাওয়া-দাওয়ার দরকার নেই। নিয়মিত, পরিমিত এবং পূর্ণমাত্রায় ও পূর্ণমেয়াদে ওষুধ সেবন করলে অবশ্যই যক্ষ্মা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়।

brac

BRAC Media Award 2015
Division Online

1st prize: Prpsdyot Barua

বাংলা
(bangla/index.php)

Pradyot Sri Barua

An example of successful combat against Tuberculosis

DHAKA, Sept 11, 2014 (BSS)- Tuberculosis or TB in short is curable and no longer a serious threat to the human being. An affected can be fully cured of the disease if it follows a six month anti-biotic course properly on physician's advice.

In Bangladesh combating TB has been highly successful under directly observed treatment short course system or DOTS and so showing the path to other TB-prone countries to follow. TB infects one-third of the people living on the globe.

Feroza Khatun, 55, a resident of Uttar Pairtala village in Brahmanbaria Sadar upazila, fell in trouble in old age as she suffered from fever and cold for a long time. One day, her neighbour Hasina Begum, a BRAC-appointed Shastha Shebika (SS), came to know about her condition and collected her sputum and sent it to Brahmanbaria Sadar upazila health complex where the diagnosis proved that she contracted Tuberculosis (TB).

Hasina advised her to remain tension-free as drugs of the disease are available and it will be cured with the regular intake of that for six months. She regularly took the drugs free of cost from the Shebika under Directly Observed Treatment Short course (DOTS) system and she was cured six months later.

Hasina Begum is one of the SS appointed by BRAC for providing services to the TB-affected people across the country. Brahmanbaria district is the most successful region in this project.

Mofiz Uddin, 60, another TB patient under Sadar upazila said, "I was a TB patient one year ago. One day, a

BRAC medical worker came to my house and treated me well. Now, I am free from TB and totally fit. I pay my heartiest thanks to the government and BRAC.

BRAC field level activists said, "We segregate TB affected people to three parts under type-1, type-2 and MDR (Multi Drug Register)

The government started DOTS programme in 1993. According to ministry of Health and Family Welfare planning data, about 3 lakh people of Bangladesh are affected by TB. Of them, nearly 70,000 people die every year.

BRAC, is the largest among all NGOs' participating as partners of the government to implement the programme. BRAC is working in this programme under Health Nutrition Population Programme (HNPP) project with the government. Because of this programme, it is expected that the death caused by TB would come down to half within 2015.

Tuberculosis (TB) is not exclusively an infectious disease, as only a small fraction of those individuals exposed to Mycobacterium tuberculosis develop clinical disease. Evidence has accumulated that TB is also a genetic disease, and human genetic factors have been recently identified in resistance to TB infection, severe childhood TB, and, to a lesser extent, in pulmonary TB. Refined genetic studies are being conducted in these TB-related phenotypes, taking advantage of new genomic technologies. Identification of the human genetic variants controlling key steps of TB pathogenesis are expected to have major implications for TB control and the development of novel treatments.

According to data, BRAC has 80,000 Shastha Shebika providers and they are working at village level to implement the project.